ইসকনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র
অমৃতের সন্ধানে

একঘন্টা কীর্তন করার পর, শ্রীল প্রভুপাদ কীর্তন থামিয়ে ভাষণ দিতে শুরু করলেন– "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। এটি হচ্ছে শব্দতরঙ্গ, এবং আমাদের বুঝতে হবে যে, এই শব্দতরঙ্গ অপ্রাকৃত। আর যেহেতু এটি অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ, তাই তার ভাষা এবং অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করতে পারলেও তা সকলকেই অনুপ্রাণিত করে। এটি হচ্ছে তার মাধুর্য। এমন কি, শিশুরা পর্যন্ত এতে যোগ দিতে পারে......।"
পাঁচ মিনিট ভাষণ দেওয়ার পর, শ্রীল প্রভুপাদ আবার কীর্তন করতে শুরু করলেন। কয়েকটি ছেলে-মেয়ে হাত ধরে বৃত্তাকারে স্বামীজীর সামনে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। তারপর তারা তাঁকে পরিক্রমা করতে লাগল। আর তারা হাত ধরাধরি করে লাফিয়ে লাফিয়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে করতে নাচতে লাগল। সেই তৃণাচ্ছাদিত মাঠের ওপর স্বামীজী সকলের কার্যকলাপ দর্শন করতে লাগলেন। তাঁকে দেখে মনে হল, তাঁকে ঘিরে যে দলটি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে করতে ঘুরে ঘুরে নাচছিল, তাদের প্রতি তিনি যেন গভীরভাবে সন্তুষ্ট হয়েছেন।
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)-এর
প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

কথয়স্ব মহাভাগ যথাহমখিলাত্মনি। কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্ ॥ ভাগবতঃ ২/৮/৩ ॥
অনুবাদঃ হে মহাভাগ্যবান শুকদেব গোস্বামী, দয়া করে আপনি শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বর্ণনা করতে থাকুন যাতে আমি জড় গুণ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে আমার মনকে পরমাত্মায়, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে নিবেশিত করে আমার কলেবর পরিত্যাগ করতে পারি।

দেশব্যাপী ইস্‌কনের রথযাত্রা উৎসব- ২০০৮

বগুড়া

তারাগঞ্জ-রংপুর

নোয়াখালী

খুলনা

চাঁদপুর

হবিগঞ্জ

সিলেট

নরসিংদী

ঢাকা

বরিশাল

ফরিদপুর

কুমিল্লা

শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব- ২০০৮

ঢাকেশ্বরী মন্দিরে শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজের বক্তব্য

স্বামীবাগ আশ্রমে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান

স্বামীবাগ আশ্রমে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের আরতি নিবেদন

শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে বিশ্বশান্তি কামনায় অগ্নিহোত্র যজ্ঞ

জাগ্রত ছাত্র সমাজের সদস্যদের "হরেকৃষ্ণ নৃত্য"

বৃন্দাবন থেকে আগত রাধা রমণ প্রভুর ভাগবত কীর্তন পরিবেশন

রথযাত্রায় ইস্কন স্বেচ্ছাসেবক ভক্তবৃন্দের একাংশ

শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ইস্‌কনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(কেবলমাত্র সদস্যদের জন্য)

ত্রয়োদশ বর্ষ ◗ চতুর্থ সংখ্যা ◗ অক্টোবর ◗ নভেম্বর ◗ ডিসেম্বর ২০০৮ ইং

প্রতিষ্ঠাতা ঃ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) এর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের নির্দেশানুসারে, বাংলাদেশ ইস্‌কন গভর্নিংবডি কমিশনার ও গুরুবর্গের কৃপায়

সম্পাদক ঃ শ্রী চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী
নির্বাহী সম্পাদক ঃ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ দাস
সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রী রামেশ্বর চরণ দাস ব্রহ্মচারী
শ্রী দ্বিজেশ্বর গৌর দাস ব্রহ্মচারী

বাংলাদেশ ইস্‌কন ফুড ফর লাইফ কর্তৃক প্রকাশিত

প্রধান উপদেষ্টা ঃ শ্রী ননী গোপাল সাহা
বিশেষ উপদেষ্টা ঃ শ্রী সত্যরঞ্জন বাড়ৈ, [illegible]
পৃষ্ঠপোষকতায় ঃ শ্রী চিত্ত রঞ্জন পাল
শ্রী অনিল ঘোষ

স্বত্ত্বাধিকারী ঃ ইস্‌কন ফুড ফর লাইফ

আনুকূল্য ঃ প্রতিকপি-২০.০০ টাকা
এবং বাৎসরিক গ্রাহক আনুকূল্য
রেজিঃ ডাকে - ১২০.০০টাকা

কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন ঃ প্রসেনজিৎ রাজবংশী ভক্ত

যোগাযোগ করুন
'ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে'
স্বামীবাগ আশ্রম: ৭৯,৭৯/১, স্বামীবাগ রোড, ঢাকা- ১১০০
ফোন ঃ ৭১২২৪৮৮, ০১৯১৭৫১৮৮২৭

সূচীপত্র

❋ প্রচ্ছদপট ❋

সমস্ত জগতের আশ্রয় স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশনায় সমস্ত ব্রজবাসীগণ দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা বন্ধ করে গিরিগোবর্ধনের পূজা করেছিলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র ক্রোধান্বিত হয়ে প্রবল ঝড় এবং বারী বর্ষণ করে। ব্রজবাসীগণ সেই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করলে সাত বছর বয়সের কৃষ্ণ তাঁর বাম হাতের কণিষ্ঠা আঙ্গুলের অগ্রভাগে ২১ কিলোমিটার পরিধি গিরিগোবর্ধনকে সাতদিন ধারণ করে ব্রজবাসীদের প্রবল ঝড় ও বর্ষণ থেকে রক্ষা করেছিলেন।

বৈষ্ণব পঞ্জিকা

গৌরাব্দ- ৫২২, বঙ্গাব্দ- ১৪১৪-১৫১৫, খ্রিষ্টাব্দ- ২০০৮

তারিখ		অনুষ্ঠান
২২ পদ্মনাভ, ১৯ আশ্বিন, ৬ অক্টোবর ২০০৮, সোমবার	ঃ	**শ্রীশ্রী দুর্গা পূজা।**
২৬ পদ্মনাভ, ২৩ আশ্বিন, ১০ অক্টোবর ২০০৮, শুক্রবার	ঃ	শ্রীশ্রী রামচন্দ্রের বিজয়োৎসব। শ্রীপাদ মাধ্বাচার্যের আবির্ভাব।
২৭ পদ্মনাভ, ২৪ আশ্বিন, ১১ অক্টোবর ২০০৮,শনিবার	ঃ	**পাশাঙ্কুশা একাদশীর উপবাস।**
২৮ পদ্মনাভ, ২৫ আশ্বিন, ১২ অক্টোবর ২০০৮, রবিবার	ঃ	**একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৫.৫৪ মিঃ থেকে ০৭.২৭ মিঃ মধ্যে।** শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর তিরোভাব। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব।
৩০ পদ্মনাভ, ২৭ আশ্বিন, ১৪ অক্টোবর ২০০৮, মঙ্গলবার	ঃ	শ্রী শ্রী লক্ষ্মী পূজা, শ্রীকৃষ্ণের শারদীয় রাসযাত্রা। চাতুর্মাস্যের ৪র্থ মাস শুরু, (এক মাস মাষকলাই বর্জন)। শ্রীল মুরারি গুপ্তের তিরোভাব।
৫ দামোদর, ২ কার্তিক, ১৯ অক্টোবর ২০০৮, রবিবার	ঃ	শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব।
৭ দামোদর, ৪ কার্তিক, ২১ অক্টোবর ২০০৮, মঙ্গলবার	ঃ	শ্রীরাধা কুণ্ডের আবির্ভাব। বহুলাষ্টমী, শ্রীল বীরভদ্র প্রভুর আবির্ভাব।
১০ দামোদর, ৭ কার্তিক, ২৪ অক্টোবর ২০০৮, শুক্রবার	ঃ	**রমা একাদশীর উপবাস।**
১১ দামোদর, ৮ কার্তিক, ২৫ অক্টোবর ২০০৮, শনিবার	ঃ	**একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৮.৫০ মিঃ থেকে ০৯.৪৮ মিঃ মধ্যে।**
১৪ দামোদর, ১১ কার্তিক, ২৮ অক্টোবর ২০০৮, মঙ্গলবার	ঃ	দীপাবলী, দীপদান, স্বামীবাগ মন্দিরে শ্রীশ্রী কালীপূজা।
১৬ দামোদর, ১৩কার্তিক, ৩০ অক্টোবর ২০০৮, বৃহস্পতিবার	ঃ	**শ্রীশ্রী গোবর্ধন পূজা, গৌ পূজা, (অন্নকূট মহোৎসব)।**
১৯ দামোদর, ১৬কার্তিক, ২ নভেম্বর ২০০৮, রবিবার	ঃ	**শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের তিরোভাব, (দুপুর পর্যন্ত উপবাস)**
২৩ দামোদর, ২০কার্তিক, ৬ নভেম্বর ২০০৮, বৃহস্পতিবার	ঃ	শ্রী গোপাষ্টমী ও গোষ্ঠাষ্টমী
২৪ দামোদর, ২১কার্তিক, ৭ নভেম্বর ২০০৮,শুক্রবার	ঃ	শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী পূজা।
২৬ দামোদর, ২৩কার্তিক, ৯ নভেম্বর ২০০৮, রবিবার	ঃ	**উত্থান একাদশীর উপবাস।** (শ্রী ভীষ্মপঞ্চক ব্রত শুরু (৫ দিন)। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব।
২৭ দামোদর, ২৪ কার্তিক, ১০ নভেম্বর ২০০৮, সোমবার	ঃ	**একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ৬.১০ মিঃ থেকে ০৯.৫১ মিঃ মধ্যে।**
৩০ দামোদর, ২৭ কার্তিক, ১৩ নভেম্বর ২০০৮, বৃহস্পতিবার	ঃ	শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা, তুলসী-শালগ্রাম বিবাহ। শ্রীপাদ নিম্বার্ক আচার্যের আবির্ভাব। চাতুর্মাস্য ব্রত এবং নিয়ম সেবা মাস সমাপ্ত। (পূর্ণিমা)
১ কেশব, ২৮ কার্তিক, ১৪ নভেম্বর ২০০৮, শুক্রবার	ঃ	কাত্যায়নী ব্রত আরম্ভ।
১০ কেশব, ৭ অগ্রহায়ণ, ২৩ নভেম্বর ২০০৮, রবিবার	ঃ	**উৎপন্না একাদশীর উপবাস।** **শ্রীল নরহরি সরকারের তিরোভাব।**
১১ কেশব, ৮ অগ্রহায়ণ, ২৪নভেম্বর ২০০৮, সোমবার	ঃ	**একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৬.১৯ মিঃ থেকে ০৯.৫৬ মিঃ মধ্যে।**
২৬ কেশব, ২৩ অগ্রহায়ণ, ৯ ডিসেম্বর ২০০৮, মঙ্গলবার	ঃ	**মোক্ষদা একাদশীর উপবাস,** **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা জয়ন্তী উৎসব**
২৭ কেশব, ২৪ অগ্রহায়ণ, ১০ ডিসেম্বর ২০০৮, বুধবার	ঃ	**একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৬.৩০ মিঃ থেকে ০৯.২৪ মিঃ মধ্যে।**
২৯ কেশব, ২৬ অগ্রহায়ণ, ১২ ডিসেম্বর ২০০৮, শুক্রবার	ঃ	পূর্ণিমা, কাত্যায়নী ব্রত সমাপ্ত।
৩ নারায়ণ, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৮, মঙ্গলবার	ঃ	শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের তিরোভাব (দুপুর পর্যন্ত উপবাস) ধনুষ সংক্রান্তি।
৮ নারায়ণ, ৫ পৌষ, ২১ ডিসেম্বর ২০০৮, রবিবার	ঃ	শ্রীল সুভগ স্বামী মহারাজের আবির্ভাব। (ব্যাস পূজা)।
১০ নারায়ণ, ৭ পৌষ, ২৩ ডিসেম্বর ২০০৮, মঙ্গলবার	ঃ	**সফলা একাদশীর উপবাস।**
১১ নারায়ণ, ৮ পৌষ, ২৪ ডিসেম্বর ২০০৮, বুধবার	ঃ	**একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৬.৩৮ মিঃ থেকে ১০.১১ মিঃ মধ্যে।**

শ্রীকৃষ্ণকে শুধুই ভালবাসুন

– শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাবদ্
যা তে দশাশ্রুকলিলাঞ্জনসম্ভ্রমাক্ষম্ ।
বক্তং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য
সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি॥

- শ্রীমদ্ভাগবত ১/৮/৩১

কুন্তীদেবী প্রার্থনা জানিয়েছিলেন এই শ্লোকে– "প্রিয় কৃষ্ণ যখন তুমি অপরাধ করেছিলে, তখন মা যশোদা তোমাকে বন্ধনের উদ্দেশ্যে একটি দড়ি হাতে নিয়েছিলেন, আর তখন তোমার উদ্বেগাকুল চোখ দুটি অশ্রু প্লাবিত হয়ে তোমার চোখ থেকে অঞ্জন ধুয়ে ফেলেছিল। আর তুমি হয়ে উঠেছিলে ভীত-সন্ত্রস্ত, যদিও মূর্তিমান ভয় তোমারই ভয়ে ভীত হয়ে থাকে। এই দৃশ্য আমার কাছে বিভ্রান্তিকর।

পরমেশ্বর ভগবানের লীলার মাধ্যমে সৃষ্ট এ এক বিভ্রান্তির ব্যাখ্যা। পরমেশ্বর ভগবান সকল ক্ষেত্রে পরম। ভগবান যে পরম, এবং সেই সাথে তিনি যে শুদ্ধ ভক্তের কাছে খেলার মতো, এটি একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত।

পরমেশ্বরের শুদ্ধ ভক্ত অবিমিশ্র ভালবাসাতেই পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে সেবা নিবেদন করে থাকেন, এবং ঐ ধরনের সেবা নিবেদনের সময়ে শুদ্ধ ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের ভগবত্তার কথা বিস্মৃত হন। যখন ভগবৎ ভক্তিসেবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্ভ্রম শ্রদ্ধা ভয়হীন শুদ্ধ প্রীতির বশে নিবেদিত হয়, তখন পরমেশ্বর ভগবানও আরও বেশী করে আস্বাদনীয় ভাবে তাঁর ভক্তদের সেই প্রেমময়ী ভক্তিসেবা গ্রহণ করে থাকেন।

সাধারণত ভক্তেরা সসম্ভ্রমে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করে থাকেন, কিন্তু যখন ভক্ত শুধু প্রীতি আর ভালবাসায় পরমেশ্বর ভগবানকে নিজের থেকে কম গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, তখন ভগবান আরও বিশেষভাবে সন্তোষ লাভ করেন। ভগবানের প্রকৃত ধাম গোলোক বৃন্দাবনে এই মনোভাব নিয়ে ভগবানের লীলা বিনিময় হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের সখারা তাঁকে তাঁদেরই মাঝে একজন মনে করে থাকেন। তাঁরা তাঁকে সসম্ভ্রমে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন না। পরমেশ্বরের পিতামাতা (যাঁরা শুদ্ধ ভক্ত) তাঁকে নিতান্ত এক শিশু বলেই মনে করেন। ভগবান তাঁর পিতামাতার তিরস্কারগুলিকে বৈদিক স্তবস্তুতির চেয়েও বেশি প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করে থাকেন। ঠিক সেই রকমভাবেই, তাঁর প্রেমাস্পদা কান্তাদের ভৎসনাদিকেও তিনি বৈদিক বন্দনার চেয়ে বেশি উপাদেয় বলে মনে করেন।

যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন জনসাধারণকে তাঁর অপ্রাকৃত ধাম গোলোক বৃন্দাবনের
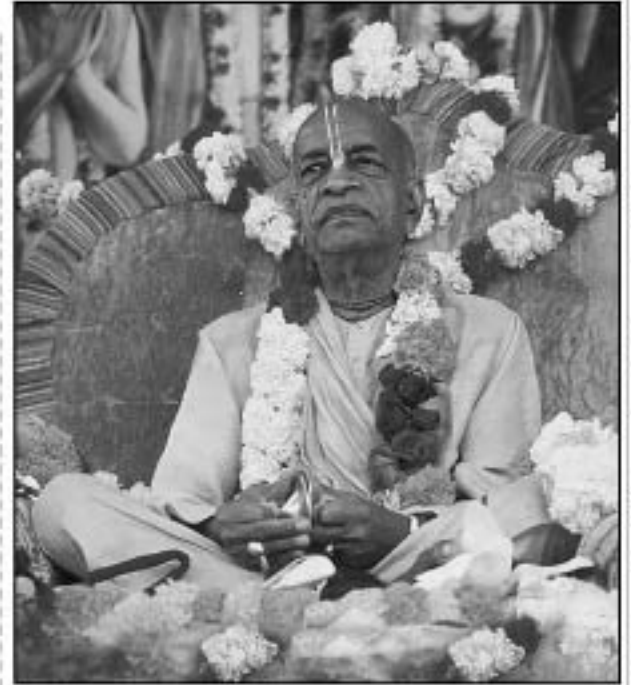
সনাতন লীলা প্রকাশের মাধ্যমে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে, তখন তিনি তাঁর পালিকা মাতা যশোদার সামনে আনুগত্যের এক অদ্বিতীয় লীলা প্রকটিত করেছিলেন।

পরমেশ্বর তাঁর স্বভাবজাত শিশুসুলভ খেলার ছলে মাখনের পাত্রগুলি ভেঙ্গে ফেলতেন এবং মা যশোদার জমিয়ে-রাখা মাখন নষ্ট করে দিতেন, সখা-সখীদের মধ্যে, এমন কি, বৃন্দাবনের সুপরিচিত বানরদের মাঝেও তা বিলিয়ে দিতেন, আর বানরকুলও পরমেশ্বরের এই বদান্যতার সুযোগ বেশ ভালভাবেই উপভোগ করত।

যশোদা মাতা তা দেখলেন এবং তাই তাঁর শুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমের বশে তাঁর দিব্য শিশুটিকে শাস্তিদানের ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন। তিনি একটা দড়ি নিয়ে পরমেশ্বরকে ভয় দেখালেন যে তাঁকে বেঁধে রাখবেন, যেমন সাধারণ গৃহস্থ বাড়িতে করা হয়ে থাকে।

মা যশোদার হাতে দড়িগাছা দেখতে পেয়ে, পরমেশ্বর মাথা নিচু করে শিশুর মতোই কাঁদতে শুরু করলেন, আর তাঁর গলা বেয়ে চোখের জলের ধারা নামতে থাকল, তাঁর সুন্দর চোখ দুটিতে লাগানো কালো কাজলের রেখা তাতে সব গেল ধুয়ে।

পরমেশ্বরের এই দৃশ্য কুন্তীদেবীর দ্বারা বন্দিত হয়েছিল, কারণ তিনি পরমেশ্বরের পরম পদ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। অহরহ মূর্তিমান ভয়ও পরমেশ্বরের কাছে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে

থাকলেও, তিনি তাঁর জননীকে ভয় করতেন। কারণ জননী তাঁকে ঠিক সাধারণ এক শিশুর মতোই শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন।

কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের সুমহান মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, যশোদা মাতা ছিলেন না। তাই যশোদার মর্যাদা ছিল কুন্তীর চেয়ে অনেক মহত্তর। মাতা যশোদা পরমেশ্বরকে তাঁর সন্তানরূপে পেয়েছিলেন, আর পরমেশ্বর তাঁকে একেবারে ভুলিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর শিশুসন্তানটি পরমেশ্বর স্বয়ং।

যদি মা যশোদা পরমেশ্বরের সুমহান মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতেন, তা হলে অবশ্যই তিনি পরমেশ্বরকে শাস্তিদানে দ্বিধাগ্রস্তই হতেন। কিন্তু এই পরিস্থিতি তাঁকে বিস্মৃত করে দেওয়া হয়েছিল, যেহেতু পরমেশ্বর অভিলাষ করেছিলেন যে, স্নেহময়ী যশোদার কাছে তিনি শৈশবলীলার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন।

জননী এবং পুত্রের মাঝে এই স্নেহ-বাৎসল্য বিনিময় স্বাভাবিক ভাবেই ঘটেছিল, এবং কুন্তীদেবী সেই দৃশ্য স্মরণ করে বিভ্রান্তি বোধ করেছিলেন, আর এই দিব্য বাৎসল্য প্রেমের প্রশংসা না করে তিনি পারেননি। পরোক্ষভাবে, মাতা যশোদা তাঁর অনন্য বাৎসল্য প্রেমের মর্যাদার জন্য বন্দিত হয়েছেন, কারণ তাঁর প্রিয় সন্তানরূপে তিনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরকেও শাসন করতে পেরেছিলেন।

এই লীলার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের এক ঐশ্বর্য উদ্ঘাটিত হয়েছে- তাঁর সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য। শ্রীকৃষ্ণের রয়েছে ষড়ৈশ্বর্যঃ সমগ্র ধন, সমগ্র শক্তি, সমগ্র বিভূতি, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য এবং সমগ্র সৌন্দর্য-শ্রী। শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতি এমন যে, তিনি মহত্তম থেকে মহত্তর, এবং ক্ষুদ্রতম হতেও ক্ষুদ্রতর (অণোরণীয়ান মহতো মহিয়ান)। আমরা সসম্ভ্রমে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি জানাই, কিন্তু কেউই 'কৃষ্ণ' তুমি অপরাধ করেছ, তাই এখনই তোমাকে বাঁধব বলে এক গাছি দড়ি নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে আসে না। তবুও এটাই হল সর্বোত্তম ভক্তের অধিকার এবং শ্রীকৃষ্ণ এইভাবেই তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে দেখতে চান।

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের কথা ভেবে, কুন্তীদেবী মাতা যশোদার ভূমিকা গ্রহণে সাহসী হননি, কারণ কুন্তীদেবী যদিও ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পিসী, তা সত্ত্বেও মা যশোদার মতো শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আচরণের বিশেষ অধিকার তাঁর ছিল না। যশোদার মা ছিলেন এমনই উন্নত ভক্ত যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে তিরস্কার করবারও অধিকার তাঁর জন্মেছিল। সেটাই ছিল যশোদার বিশেষ অধিকার।

কুন্তীদেবী কেবল ভাবছিলেন, যশোদা মা কী সৌভাগ্য যে, তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানকেও তিরস্কার করতে পেরেছিলেন- যে-ভগবানের কাছে মূর্তিমান ভয়ও ভীত-ত্রস্ত হয়ে থাকে (ভিরপি যৎ বিভেতি)। শ্রীকৃষ্ণকে ভয় না করে কে? সবাই। তবু শ্রীকৃষ্ণ যশোদা মার ভয়ে ভীত হন। এই হল শ্রীকৃষ্ণের সুমহান চমৎকারিত্ব।

এই ধরনের ঐশ্বর্যের আরও একটি দৃষ্টান্ত দিতে গেলে বলতে হয়, শ্রীকৃষ্ণকে সকলেই মদনমোহন নামে জানে। মদন হচ্ছেন কন্দর্প। কন্দর্প সকলের হৃদয়কে বিমোহিত করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এমন ভুবনমোহন সৌন্দর্য যে, তিনি কন্দর্পকেও বিমোহিত করেন। শুধু তাই নয়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও আবার শ্রীমতী রাধারাণী কর্তৃক বিমোহিত হন আর তাই তো শ্রীমতী রাধারাণী মদনমোহনমোহিনী নামে পরিচিতা, কন্দর্পের বিমোহনকারীর বিমোহনকারিণী। শ্রীকৃষ্ণ হলেন মদনমোহন, আর শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন মদনমোহনমোহিনী।

শ্রীকৃষ্ণভাবনা চর্চার ক্ষেত্রে এগুলি অতি উন্নত পর্যায়ের পারমার্থিক তত্ত্ব উপলব্ধি। এগুলি নিছক কল্পিত কাহিনী, অলীক গল্পকথা, বা মনগড়া কিছু নয়। এ সবই বাস্তব সত্য এবং ভক্তই যথার্থভাবে ভক্তিসেবা চর্চার ক্ষেত্রে উন্নত হতে পারলে এ সবই উপলব্ধির সুযোগ পেতে পারেন এবং অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের লীলাপ্রকাশের মাঝে অংশগ্রহণ করতেও পারেন। আমাদের ভাবা উচিত নয় যে, যশোদা মাতা যে-সুযোগ লাভ করেছিলেন, তা আমাদের প্রাপ্য নয়। যে কেউ সেরকম সুযোগ পেতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণকে নিজ সন্তান-রূপে বাৎসল্য রসে আরাধনা করলে, যে কেউ ঐ ধরনের সুযোগ-সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন, কারণ সন্তানের প্রতি জননীরই প্রেম-প্রীতি সব চেয়ে বেশি হয়ে থাকে।

এমন কি, এই জড় জগতেও মায়ের স্নেহ-ভালবাসার তুলনা নেই, কারণ কোনও কিছু প্রত্যাশা না করেই মা তাঁর সন্তানকে ভালবাসেন।

অবশ্য, কথাটা সচারাচর সত্য হলেও, এই জড় জগতটাই এমনই কলুষিত যে, মা-ও কখনও ভাবেন, "আমার সন্তান বড় হবে আর যখন সে রোজগার করবে, আমি পাব।" তাই মায়ের ভালবাসার ক্ষেত্রেও সেখানে খানিকটা প্রত্যাশা থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসার সময়ে কোনও স্বার্থ অভিসন্ধি থাকে না, কারণ সেই কৃষ্ণপ্রেম অবিমিশ্র, নিষ্কলুষ, জড় অভিলাষ মুক্ত অভিলাষিতাশূন্যম্ ।

কোনও জড়জাগতিক বিষয়প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসা জানানো অনুচিত। এমন নয় যে, আমরা বলব, "হে কৃষ্ণ, তুমি আমাদের প্রতিদিনের আহার জোগাও, আর তা হলে আমি তোমাকে ভালবাসব। কৃষ্ণ, তুমি আমাকে এটা দাও, সেটা দাও, আর তবেই তো তোমাকে ভালবাসব।" ওরকম ব্যবসাদারী লেনদেন থাকা চলবে না, কারণ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের অকৃত্রিম ভালবাসাই পেতে চান।

যখন শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন, মা যশোদা একটা দড়িগাছি নিয়ে আসছেন তাঁকে বাঁধবেন বলে, তিনি তখনই এই ভেবে

নিদারুণ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন, "ও হো, মা আমাকে বেঁধে রাখতে চলেছেন।" তিনি কাঁদতে শুরু করলেন, আর অশ্রুজলে তাঁর চোখের কাজল গেল ধুয়ে। মায়ের দিকে অতি সম্ভ্রম সহকারে তাকিয়ে থেকে তিনি আবেগ ভরে আবেদন জানিয়েছিলেন, "হ্যাঁ, মা, আমি তোমার কাছে অপরাধ করেছি। দয়া করে তুমি আমাকে ক্ষমা কর।" তখন তিনি তৎক্ষণাৎ মাথা নত করেছিলেন।

কুন্তীদেবী এই দৃশ্যটির জয়গান করেছেন, কারণ এটাও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য সমগ্রের অন্যতম। যদিও তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তা সত্ত্বেও তিনি মা যশোদার শাসনে নিজেকে সঁপে দেন।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় (৭/৭) পরমেশ্বর ভগবান বলছেন, মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়ঃ "প্রিয় অর্জুন, আমার চেয়ে শ্রেয় কেউ নেই।" তবু সেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান, যাঁর থেকে শ্রেয় আর কেউ নেই, তিনিও মা যশোদার কাছে মাথা নত করে মেনে নেন, "হ্যাঁ, মা আমার, আমি অপরাধী।"

শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর ভয়ে ভীত হতে দেখে মা যশোদারও মন আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল। বাস্তবিকই তাঁর শাস্তির ফলে শ্রীকৃষ্ণ কষ্ট পাবেন, এটা মা যশোদার অভিপ্রেত ছিল না। যশোদামাতার ইচ্ছা তা ছিল না। কিন্তু এটাইরীতি, কোনও শিশু ঘরের মধ্যে খুব বিব্রত করতে থাকলে মা তাকে কোথাও বেঁধে রাখেন, এই রীতি এদেশে এখনও দেখা যায়। যেহেতু এটাই সাধারণ রীতি, তাই মা যশোদা তা গ্রহণ করেছিলেন।

শুদ্ধ ভক্তের কাছে এই দৃশ্য ভারি মনোরম, কারণ এই দৃশ্যের মাধ্যমে পরম পুরুষের অপরিসীম মাহাত্ম্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ এখানে এক আদর্শ শিশুর লীলা অভিব্যক্ত করেছেন। শৈশব-লীলা প্রকাশে তিনি নিখুঁত অভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন। ষোল হাজার মহিষীর পতিরূপেও তাঁর ভূমিকা ছিল নিখুঁত; ব্রজগোপীদের প্রেমিক রূপে তাঁর লীলাও ছিল অনন্য, আবার গোপবালকদের সাথে সখ্যতার লীলা প্রকাশেও তিনি ছিলেন অননুকরণীয়।

গোপসখারা সকলেই ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের ভরসায়। একবার গোপসখারা তালবনের তাল খেতে ইচ্ছা করলেন, কিন্তু গর্দভাসুর নামে এক দানব কাউকেই ঐ তালবনে ঢুকতে দিচ্ছিল না। তাই শ্রীকৃষ্ণের গোপসখারা অনুরোধ জানাল,"কৃষ্ণ, আমরা তাল খাব, তুমি তার ব্যবস্থা করে দেবে? তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয় করব।"

শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীবলরাম তখনই গর্দভ-শরীরধারী অন্যান্য দানবকুল সহ ঐ গর্দভাসুর দানবের ডেরায়, সেই তালবনে, গিয়ে ঢুকলেন। গর্দভ অসুরেরা তাদের পেছনের ঠ্যাং দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীবলরামকে লাথি মারতে চেষ্টা করতেই শ্রীবলরাম তাদের একজনকে ঠ্যাং ধরে গাছের ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, তখনই সেটার প্রাণ গেল। তারপর শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীবলরাম একে একে অন্য সমস্ত গর্দভাসুরদেরও ঐভাবে প্রাণনাশ করেছিলেন। এইভাবে গোপসখারা শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বিশেষভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

আর একবার গোপসখারা আগুনের মাঝে আটকে পড়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কাউকেই তাঁরা জানতেন না বলে, শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়ে তাঁরা তখনই তাঁকে ডাকতে থাকেন, আর শ্রীকৃষ্ণও ছিলেন প্রস্তুতঃ "হ্যাঁ।" অমনি শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত আগুনের রাশি গ্রাস করে নিয়েছিলেন। বহু অসুরই গোপবালকদের আক্রমণ করত আর প্রতিদিনই ছেলেরা ঘরে ফিরে গিয়ে তাদের মায়েদের বলত, "মা, কৃষ্ণ ভারি অদ্ভুত আশ্চর্য ছেলে।

তাঁরা জানতেন না যে, শ্রীকৃষ্ণই পরম পুরুষ, পরমেশ্বর ভগবান। তাঁরা শুধু জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সত্যিই অদ্ভুত, তাঁর কাজকর্ম আশ্চর্য রকমের, আর কিছু জানতেন না। তাঁরা যতই শ্রীকৃষ্ণের এমনি সব বিস্ময়কর ব্যাপার-স্যাপার দেখতেন, বুঝতেন, ততই তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণানুরাগ বেড়ে চলত। তাঁরা ভাবতেন, "হয়ত কৃষ্ণ কোনও এক দেবতাই হবেন।"

শ্রীকৃষ্ণের পিতা, নন্দ মহারাজও যখন তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করতেন, তখন তাঁরাও বলাবলি করতেন, "ওহে নন্দ মহারাজা, সত্যিই তোমার ছেলেটি ভারি অদ্ভুত।" নন্দ মহারাজও উত্তর দিতেন, "হ্যাঁ তাই তো দেখছি। মনে হয়, কৃষ্ণ বুঝি কোনও দেবতাই হতে পারে।- এমন কি নন্দ মহারাজও সুনিশ্চিত ছিলেন না- তিনিও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ভাবতেন।

এইভাবে ভগবানের পরিচয় নিয়ে ব্রজবাসীদের কোনই আগ্রহ নেই, কোনই প্রচেষ্টা নেই, মাথাব্যথা নেই। তারা শুধু শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসে। এই যা। যারা প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা নির্ণয়ের কথা ভাবে, তারা প্রথম শ্রেণীর ভক্ত নয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাদের স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ আছে, তারাই প্রথম শ্রেণীর কৃষ্ণভক্ত।

শ্রীকৃষ্ণ হলেন অসীম, অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী। কিভাবে আমরা তাঁর বিশ্লেষণ করতে পারি। এই কাজ তাই তো অসম্ভব। আমাদের অনুভূতি উপলব্ধি সবই পরিসীমিত, আমাদের ইন্দ্রিয়াদির ক্ষমতা অতি সীমাবদ্ধ, তাই নিয়ে তো শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে গবেষণা চর্চা করা চলে না। শ্রীকৃষ্ণকে যাচাই করা তাই সত্যিই অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বয়ং কিছুটা মাত্র আত্মপ্রকাশ করেন, তখন সেই উপলব্ধিটুকুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট বলে মেনে নিতে হয়।

মায়াবাদী দার্শনিকদের মতো শুষ্ক তর্ক-বিতর্কের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পর্যালোচনা করে ভগবৎ-তত্ত্ব অন্বেষণে উদ্যোগী হওয়া অনুচিত, কারণ ওরা বলে, "নেতি নেতি- এটা ভগবান নয়, ওটাও ভগবান নয়।" কিন্তু ভগবানের যথার্থ স্বচ্ছ পরিচয়ও তাদের কাছে নেই। জড়বাদী বিজ্ঞানীরাও সৃষ্টির

বাকী অংশ ১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

হিন্দু

– শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইংরেজী ১৮৭৪ সালের ২৬শে জুন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় 'হিন্দু' শব্দের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদান করেছিলেন–

অনেক দিবস হইল 'হিন্দু' শব্দের মূল লইয়া পণ্ডিত মণ্ডলীতে তর্ক-বিতর্ক হইতেছে। কেহ বলেন– সিন্ধুনদী হইতে, কেহ বলেন– হিন্দুকুশ পর্ব্বত হইতে, কেহ বলেন– ইন্দু শব্দ হইতে 'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি। কেহ কেহ বলেন যে, যবনেরা ঘৃণা করিয়া আমাদিগকে হিন্দু বলিত। কোন কোন পণ্ডিত তন্ত্রশাস্ত্র হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া হিন্দু শব্দের ব্যাখ্যা করেন। "হীনান ধর্ম্মান পরিত্যজ্য হিন্দুঃ স পরিকীর্ত্তিতঃ" ইহাতেও সন্দেহ দূর হয় না। সম্প্রতি আমরা নিম্নলিখিত চারটি শ্লোকে হিন্দু শব্দের অর্থ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম।

উত্তরে ভারতস্যাস্য হিমাদ্রি দিব্যদর্শনঃ।
দক্ষিণে বর্ত্ততে বিন্দুসরস্তীর্থো মনোহরঃ॥
এতয়োর্ম্মধ্যভাগে যো বসতিং কুরুতে নরঃ।
আদ্যন্তবর্ণ-সংযোগাৎ হিন্দুনাম্না মহীয়তে॥
শুদ্ধার্য্যকুলসম্ভূতঃ শুদ্ধাচারপরায়ণঃ।
ভারতে বর্ত্ততে হিন্দুর্বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ॥
পূজনীয়ঃ সদা হিন্দুঃ সর্ব্বেষাং দ্বিপদামপি।
শিক্ষকঃ সর্ব্বজাতীনাং মহীতল-নিবাসিনাম্॥

অর্থঃ "এই ভারতবর্ষে উত্তরাংশে হিমাদ্রি নামে দিব্যদর্শন পর্ব্বত আছে। দক্ষিণাংশে বিন্দুসর নামে এক মনোহর তীর্থ আছে। যে ব্যক্তি এই দুইয়ের মধ্যে বাস করেন, তিনি হিমালয়ের আদ্যক্ষর ও বিন্দুর শেষাক্ষর সংযোগ দ্বারা হিন্দু নামের মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হন। শুদ্ধ আর্য্যকুল-সম্ভূত ও শুদ্ধাচারপরায়ণ হিন্দু বর্ণাশ্রম বিভাগ করত ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিতেছেন। হিন্দু মনুষ্যমাত্রেরই পূজনীয় এবং সমস্ত জাতির শিক্ষক।"

হিমালয় পর্ব্বত যে-স্থলে আছে, তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু বিন্দুসর কোথায় তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে ২১ অধ্যায়ে কর্দ্দমপ্রজাপতি-সংবাদে এরূপ কথিত আছে–

তস্মৈ বিন্দুসরো নাম সরস্বত্যা পরিপ্লুতং।
পুণ্যং শিবামৃতজলং মহর্ষিগণ-সেবিতম্ ॥৩৭॥

এতদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে, সরস্বতী নদীর সন্নিকটেই বিন্দুসর। সম্প্রতি গুর্জ্জর রাষ্ট্রদেশে বিন্দুসর দৃষ্ট হয়। আমাদের বিবেচনায় ঐ বিন্দুসরই হিন্দু স্থানের দক্ষিণসীমা। ঐ সীমা ধরিলে আর্য্যাবর্ত্ত ও ব্রহ্মাবর্ত্ত দুই খণ্ডই হিন্দুস্থানের মধ্যবর্তী হয়।
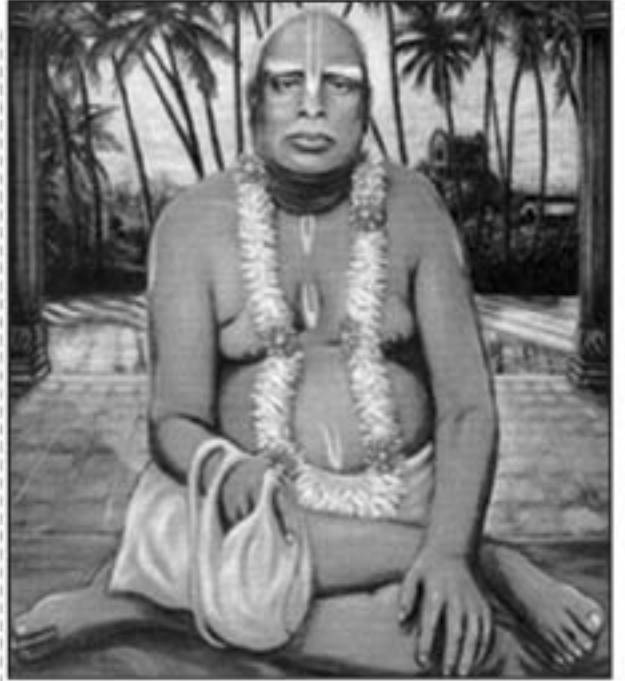
শাস্ত্রে 'হিন্দু' শব্দের উল্লেখ না থাকার হেতু এই যে, আর্যগণ হিন্দুস্থানে আসিবার পূর্ব্বেই বেদসমূহ রচিত হইয়াছিল। যৎকালে পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র-সকল লিখিত হয়, তখন আর্য্য-বংশীয়েরা আর্য্যাবর্ত্ত ও ব্রহ্মাবর্ত্ত অতিক্রম করিয়া স্থানে স্থানে বাস করিয়াছিলেন। এজন্য তৎপূর্ব্বে নির্দীত 'হিন্দু' নামটি অসম্যক হইবে বোধ করিয়া পুরাণাদিতে ব্যবহার করেন নাই। এতৎপ্রযুক্ত 'হিন্দু' নামটি কেবল বাচনিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দর্শন-শাস্ত্র

দর্শন-শাস্ত্র যে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। দর্শন বস্তুতঃ বহুবিধ হইলেও স্থূল-সূক্ষ্ম বিষয় বিচারদ্বারা ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। ভারতে ষড়দর্শন বলিয়া সেই ছয়টি শ্রেণী দেদীপ্যমান। গ্রীসদেশেও সেই ছয়টি দর্শন সম্মানিত হইয়াছে। সম্প্রতি বিশেষ গবেষণাদ্বারা প্রুশদেশীয় অধ্যাপক গার্ব্ব নির্ণয় করিয়াছেন যে, এরিষ্টটল গৌতমের ন্যায় শাস্ত্রের শিষ্য, থেলিস কণাদের বৈশেষিক-শাস্ত্রের শিষ্য, সক্রেটিস মীমাংসা-শাস্ত্রে জৈমিনির শিষ্য, প্লেটো বেদান্ত-শাস্ত্রে ব্যাসের শিষ্য, পিথাগোরাস সাংখ্য-শাস্ত্রে কপিলের শিষ্য এবং জিনো যোগশাস্ত্রে পাতঞ্জলির শিষ্য।

ঐ সকল গ্রীক পণ্ডিত কোন্ সময়ে ও কি অবস্থায় ভারতে আসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহা ক্রমশঃ জানা যাইবে। তাঁহাদের সাক্ষাৎ গুরুদিগের নামই বা কি তাহা এখন

বাকী অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

লীলা-পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলা স্মরণে

– শ্রী মুরারী গুপ্ত দাস

অনন্ত কোটি জড় জগৎ ও চিন্ময় জগতের অধীশ্বর এবং অনন্ত কোটি অবতারের অবতারী লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে দ্বাপর যুগের শেষে মথুরায় কংসের কারাগারে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ-পক্ষের অষ্টমী তিথিতে। এই তিথিকে 'জন্মাষ্টমী' বলা হয়। এই তিথিটি সংবৎসরের মধ্যে অনন্য ও পবিত্রতম। সারা ভারতবর্ষে এই সর্বশ্রেষ্ঠ তিথিটি সাড়ম্বর ও নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালিত হয়ে আসছে। ইস্কন প্রতিষ্ঠিত হবার পর সারা পৃথিবীব্যাপী ইস্কনের মন্দিরগুলিতে অতি জাঁকজমক ও উৎসাহ সহকারে এই জন্মাষ্টমী মহোৎসব পালিত হচ্ছে। এর ফলে সারা পৃথিবীর জনগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভে ধন্য হচ্ছেন।

মায়াবদ্ধ জীবের জন্ম ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এক রকমের নয়। এই জড় জগতের জীব-সকল কর্মফল ভোগ করবার জন্য প্রকৃতি প্রদত্ত একটি ত্রিগুণময়ী জড় শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন মায়াধীশ বা মায়ার নিয়ন্তা, তাই তিনি বহিরঙ্গা মায়া-শক্তিজাত গুনময়ী শরীর গ্রহণ করেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে এই জড় জগতে অবতীর্ণ হন, সে সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় উল্লেখ আছে–

অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

"আমি যদিও অজ এবং আমার দিব্য-দেহ কখনও হ্রাস প্রাপ্ত হয় না, এবং যদিও আমি সমগ্র জীবের অধীশ্বর, তথাপি আমি আমার আদি দিব্য-রূপ সহ প্রতি কল্পে অবতীর্ণ হই।" (গীতা ৪/৬)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ধরাধামে তাঁর অপ্রাকৃত দিব্য লীলাবিলাস প্রকটিত করলেও সর্বশ্রেণীর মানুষেরা তাঁকে ভগবান বলে জানতে পারেন নি। সে সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে–

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥

"আমি মূঢ় ও নির্বোধদের কাছে কখনও প্রকাশিত হই না। তাদের কাছে আমি আমার যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত থাকি, এবং তার ফলে তারা জানতে পারে না যে আমি অজ ও অব্যয়।" (গীতা ৭:২৫)

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কত সুন্দর সুন্দর জায়গা থাকতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কংসের কারাগারে আবির্ভূত হলেন, কেন? তার কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ নির্মল হৃদয়ে আবির্ভূত হন। বসুদেব ও দেবকীর হৃদয় ছিল বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের আধার। তাই নিজেকে তাঁদের হৃদয়ে প্রকাশিত করে তাঁদেরকে পিতা-মাতারূপে গ্রহণ করেছিলেন। এভাবে ভক্তশ্রেষ্ঠ বসুদেব-দেবকীকে বাৎসল্য রসের মাধ্যমে তাঁদেরকে দিব্য আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত করেছিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জড় জগতে তাঁর দিব্যলীলা বিস্তার করবার জন্য আবির্ভূত হন, তখন তিনি বাৎসল্য রসের কোন শুদ্ধ ভক্তদের পিতা-মাতারূপে গ্রহণ করে থাকেন। তাই বসুদেব ও দেবকী হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পিতা-মাতা। সত্য-যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন পৃশ্নিগর্ভরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন তাঁর পিতা বসুদেবের নাম ছিল প্রজাপতি সুতপা ও তাঁর মাতা দেবকীর নাম ছিল তখন পৃশ্নি। সে-সময় লোকপিতা ব্রহ্মা প্রজা বৃদ্ধির জন্য তাঁদেরকে সন্তান উৎপাদনের নির্দেশ দান করলে, তাঁরা ভগবানের কৃপা লাভের জন্য ১২,০০০ দিব্য বছর কঠোরভাবে ইন্দ্রিয় সংযম করে তপস্যা করেছিলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের কাছে আবির্ভূত হয়ে বর দিতে চাইলে, তাঁরা ভগবানের দিব্যরূপে মোহিত হয়ে ভগবানকে তাঁদের সন্তানরূপে প্রার্থনা করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে পৃশ্নিগর্ভ নাম ধারণ করে তাঁদের সন্তানরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

ত্রেতাযুগে বসুদেবের নাম ছিল প্রজাপতি কশ্যপমুনি এবং দেবকীর নাম ছিল অদিতি। তাঁরাও ভগবানকে পুত্ররূপে

কামনা করে কঠোর ব্রত পালন করেছিলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপেন্দ্র নাম ধারণ করে তাঁদের সন্তানরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই উপেন্দ্রই হলেন ভগবান বামনদেব যিনি বলি মহারাজের সর্বস্ব হরণ করে তাঁকে কৃপা করেছিলেন। এভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করে এ জগতে আবির্ভূত হন। এই শুদ্ধ সত্ত্বের নাম 'বসুদেব'।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যোগমায়া শক্তিকে আশ্রয় করে সচ্চিদানন্দময় স্বরূপে আবির্ভূত হন। কংস কর্তৃক দেবকীর ছয়টি সন্তান নিহত হবার পর, দেবকীর সপ্তম গর্ভে ভগবানের অংশ শেষাবতার প্রকাশিত হলেন, যিনি হলেন সঙ্কর্ষণ বা বলরাম। সে সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়াকে আহ্বান করলেন এবং নির্দেশ দিলেন নন্দ মহারাজ ও যশোদার কন্যারূপে আবির্ভূত হতে এবং দেবকীর সপ্তম গর্ভকে গোকুলে অবস্থানরত রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তর করবার জন্যে, কারণ তিনি শীঘ্রই দেবকীর গর্ভে প্রকাশিত হবেন। সে জন্য দেবকীর সপ্তম গর্ভ নষ্ট হয়েছে বলে অনেকে মনে করেছিল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে বসুদেবের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েছিলেন, এবং সেখান থেকে প্রকাশিত হলেন দেবকীর হৃদয়ে। তারপর গভীর রাত্রে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম সহ চতুর্ভুজ রূপ পরিগ্রহ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কংসের কারাগারের ভিতর বসুদেব-দেবকীর সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। পরে দেবকীর অনুরোধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ রূপ ধারণ করলেন।

এই মায়িক জগতে বদ্ধ-জীবদের অণুসদৃশ আত্মার মাতৃগর্ভে প্রবেশ লাভ হয় পিতার শুক্রের মাধ্যমে। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেভাবে গর্ভে প্রবেশ করতে হয় নি। তিনি প্রথমে বসুদেবের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জড় জগতে আসেন, তখন তিনি তাঁর ধাম ও পার্ষদ সহ অবতীর্ণ হন। ঠিক সেভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ সত্ত্ব-সম্পন্ন বসুদেবের হৃদয়ে তাঁর রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর সব কিছু নিয়ে আবির্ভূহ হয়েছিলেন। সুতরাং শুদ্ধ ভক্তদের হৃদয়, ধাম স্বরূপ যেখানে ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হন।

লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক দ্বাপর যুগে অবতীর্ণ হন না। সে-সমন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লেখ আছে–

"পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥
ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চারিযুগ জানি।
সেই চারিযুগে দিব্য একযুগ মানি॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তরে।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥
'বৈবস্বত'-নাম এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগ গেলে তাহার অন্তর॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৩/৫-১০)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খামখেয়ালীপূর্ণ বা যখন-তখন এই জগতে আসেন না। তিনি আসেন দ্বাপর যুগের শেষের দিকে– তা আবার প্রত্যেক দ্বাপর যুগে নয়। লোকপিতা ব্রহ্মার দিবসের ভিতর একবার মাত্র। এক হাজার চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিন হয়, তেমনি এক হাজার চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়। ব্রহ্মার দিন ও রাত্র এই দু-হাজার চতুর্যুগের মধ্যে দু-হাজার বার দ্বাপর যুগও আসবে। অর্থাৎ দু-হাজার দ্বাপর যুগ অন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একবার এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাত্র পাঁচ হাজার বছর পূর্বে গত দ্বাপরের শেষে তাঁর রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর ও গোলোক ধাম সহ শ্রীধাম বৃন্দাবনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখনও বৃন্দাবনে গেলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য-লীলাস্থানগুলির কিছু কিছু অংশ দেখতে পাওয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ ছাড়া এক মুহূর্ত বেঁচে থাকতে চান না। তাই কৃষ্ণগত প্রাণ শুদ্ধ ভক্তগণ যেখানেই থাকুন না কেন তাঁরা সদাসর্বদাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা স্মরণে নিমগ্ন থাকেন। শিশু কৃষ্ণ পাঁচ হাজার বছর পূর্বে চৌদ্দ মাইল ব্যাপী যে গিরিগোবর্ধনকে বাঁ-হাতের কনিষ্ঠা আঙুলে উত্তোলন করেছিলেন, কৃষ্ণভক্তরা তা দর্শন ও পরিক্রমা করে এখনও শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-আশীর্বাদে ধন্য হচ্ছেন। এখনও বৃন্দাবনে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে– রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গোকুল, নন্দগ্রাম, বর্ষাণা, দ্বাদশ-বন, কেশি-ঘাট, বংশীবট, যমুনা, সেবা-কুঞ্জ, নিধু-বন, পঞ্চ-ক্রোশী বৃন্দাবন, ইত্যাদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য লীলাস্থলী। তা ছাড়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে বিরাজ করছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাজার হাজার মন্দির। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল– শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীশ্রীরাধাদামোদর, শ্রীশ্রীরাধাগোকুলানন্দ, শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর, শ্রীবঙ্কুবিহারী, শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ ইত্যাদি মন্দিরগুলি।

যে সমস্ত গৌড়ীয় ভক্তগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী শ্রীবৃন্দাবন ধাম থেকে বহু দূর-দূরান্তে বসবাস করেন, তারাও মাঝে-মধ্যে শ্রীধাম বৃন্দাবনে এসে ভগবানের এই দিব্য-লীলাস্থলী ও অপূর্ব শোভামণ্ডিত মন্দিরগুলি দর্শন ও পরিক্রমা করে দিব্য-আনন্দে নিমগ্ন হন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই ধরাধামে আগমন প্রসঙ্গে ভগবদ্গীতায় উল্লেখ আছে–

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

"যখন ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকট করি। সাধুদের পরিত্রাণ, দুস্কৃতকারীদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমি আবির্ভূত হই।" (গীতা ৪/৭-৮)

এই জগতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের তিনটি কারণের কথা ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যথাক্রমে- সাধুদের রক্ষা, অসাধুদের বিনাশ ও ধর্মের পুনর্জাগরণ। এই কার্যগুলি সম্পাদনের জন্য ভগবানের অবতারগণই যথেষ্ট, তাহলে লীলা পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেন এ কার্যগুলি করলেন? প্রকৃতপক্ষে এগুলি যুগাবতারের কাজ, কিন্তু যেহেতু সে-সময় অবতারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাই অনন্ত কোটি অবতারও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সুতরাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অসুর-হনন-লীলা করছিলেন তখন অবতারী কৃষ্ণের মধ্যে অবস্থিত চতুর্ভুজ রূপধারী শ্রীবিষ্ণুই স্বয়ং অসুরদের নিধন করছিলেন। মথুরা, দ্বারকা ও বৃন্দাবনে অসংখ্য অসুর-নিধনলীলা শ্রীবিষ্ণু কর্তৃকই সম্পাদিত হয়েছিল। আদিপুরুষ ভগবান নিজে কখনও হত্যা কার্যলীলা সম্পাদন করেন না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন লীলা-পুরুষোত্তম। তিনি এই জগতে আসেন তাঁর চিন্ময় জগতের লীলা এই জগতে প্রকট করে তাঁর প্রিয় ভক্তদের আনন্দ বর্ধন করতে। **ভগবানের পাঁচ রকম রসের ভক্ত রয়েছেন, তাঁরা হলেন- শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের ভক্ত।** ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগতে প্রকটিত হয়ে তিনটি জায়গায় তাঁর লীলা বিস্তার করেন, তা হল- মথুরা, দ্বারকা ও বৃন্দাবন। মথুরায় কংসের কারাগারে জন্মলীলা প্রকট এবং অন্যান্য লীলাদি বিস্তার করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ঐশ্বর্যের 'পূর্ণ' বিকাশ করেছিলেন। তেমনি দ্বারকায় ১৬,১০৮ জন মহিষীর সঙ্গে 'সকীয়া' লীলা-বিলাস ও যাদবদের সঙ্গে তাঁর লীলা-বিলাসগুলি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের 'পূর্ণতর' প্রকাশ। আবার গোকুল ও বৃন্দাবনে গোপাঙ্গনাদের সঙ্গে 'পরকীয়া' লীলাবিলাস এবং গোপ-সখা ও নন্দ-যশোদাদির সঙ্গে সখ্য ও বাৎসল্য লীলাদি হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের 'পূর্ণতম' প্রকাশ। সে জন্য মথুরায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'পূর্ণ' দ্বারকায় 'পূর্ণতর' এবং বৃন্দাবনে তিনি 'পূর্ণতম'।
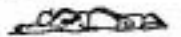
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই জগতের লীলা-বিলাসগুলিকে নিত্য-লীলা বলা হয়- কেননা তা এই জড় জগতের কালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাসগুলি কৃষ্ণের ইচ্ছায় কোন ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়, আবার কোন ব্রহ্মাণ্ডে অপ্রকটিত থাকে। যেমন পাঁচ হাজার বছর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের লীলা এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বৃন্দাবনাদি স্থানে প্রকটিত ছিল। কিন্তু এখন শ্রীকৃষ্ণের লীলা এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত নেই কারণ শ্রীকৃষ্ণ লীলা সংবরণ করেছেন।

তাঁর অর্থ এই নয় যে, জড় জগতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাস আর হচ্ছে না। শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাস ঠিকই চলছে- তা এ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে না, কিন্তু আর একটি ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর লীলা-বিলাস চলছে। যেমন রাতের বেলায় ভারতবর্ষে সূর্যকে দেখতে পাওয়া যায় না। তার অর্থ কি সে-সময় সূর্যের উদয় হয় নি? না, তা নয়। সে-সময় সূর্য ঠিকই উদিত হয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে তখন সূর্যকে দেখা না গেলেও আমেরিকা থেকে তখন সূর্যকে দেখা যাচ্ছিল কারণ তখন আমেরিকায় দিন। সূর্য সব সময় তার কক্ষপথে উদিত হয়ে আছে, কোথাও সূর্য প্রকট আর কোথাও অপ্রকট। ঠিক সেভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য-লীলা-বিলাস এক ব্রহ্মাণ্ড থেকে অন্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়ে চলেছে- এর বিরাম নেই। এভাবে অনন্ত কোটি জড় ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা-বিলাস প্রকটিত হচ্ছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলার ছেদ নেই, তাই এই লীলা-বিলাসকে নিত্য-লীলা বলা হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর লীলা সংগোপন করলেও, তিনি আমাদের কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে যান নি। তিনি যেমন তাঁর অর্চা-বিগ্রহের মধ্যে সচ্চিদানন্দ স্বরূপে বিরাজিত আছেন, তেমনি তাঁর অপ্রাকৃত নামের মধ্যেও রয়েছেন; তাই ভগবানের সান্নিধ্যে যে-কেউ লাভ করতে পারে শুধুমাত্র তাঁর দিব্য নাম কীর্তন করার মাধ্যমে। আসুন আমরা সকলে মিলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তনে নিমগ্ন হই-

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

দুর্গতিনাশিনী পরমা বৈষ্ণবী দেবী দুর্গা

- শ্রী সুখী সুশীল দাস ব্রহ্মচারী (ভক্তিশাস্ত্রী)

আমাদের এই চতুর্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডে নিম্নে সাতটি লোক এবং ঊর্ধ্বে সাতটি লোক অবস্থিত। আমাদের অবস্থান ভূলোকে। তাঁর ঊর্ধ্বে রয়েছে যে ছয়টি লোক যথা ভুব, স্বর্গ, জন, মোহ, তপ, সত্য। এই ঊর্ধ্বলোকের সমষ্টিকে বলা হয় স্বর্গ লোক। এই ভূ-লোকের নিচে রয়েছে, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল এবং পাতাল। এই নিম্ন লোকের সমষ্টিকে বলা হয় নরক।

যাঁরা পুণ্য কর্মের দ্বারা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হতে পারে, তারাই একমাত্র স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করে সোম রস পান করে, নন্দন কাননে স্বর্গসুখ উপভোগ করতে পারে। পক্ষান্তরে এই লোকে যারা পাপ কার্যানুষ্ঠান করে এবং তমোগুণে আচ্ছন্ন তারাই নরকের গভীরতম অন্ধকারে নিমর্জ্জিত হয়ে বিভিন্ন দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে।

যারা গভীরতমভাবে তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তারা আসুরিক দেহলাভ করে রসাতল, পাতাল ইত্যাদি নিম্ন গ্রহগুলিতে অত্যন্ত- দুঃখময় জীবন অতিবাহিত করে। কখনও কখনও দেখা যায় এই সমস্ত অসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা বিভিন্ন দেব-দেবীর আরাধনা করে, তাঁদের কাছ থেকে বর প্রাপ্ত হয়ে জড় জাগতিক শক্তিতে বলিয়ান হয়ে স্বর্গরাজ্য লাভ করার আশায় এ সমস্ত অসুরেরা দেবলোক আক্রমন করে থাকে। হিরণ্যকশিপু, বৃত্রাসুর, বলি ইত্যাদি পরাক্রমশালী অসুরেরা স্বর্গরাজ্যের ঐশ্বর্য ভোগ করবার জন্য বহুবার স্বর্গরাজ্য আক্রমন করে দেবতাদের বিতারিত করেছে এবং শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করেছে।

এই রকম এক দুর্ধর্ষ পরাক্রমশালী অসুর ছিল মহিষাসুর। তাঁর জন্ম কাহিনী বিভিন্ন পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে। বরাহ পুরাণ মতে দৈত্য বিপ্রচিত্তির মাহিষ্মাতী নামে পুত্রী সিন্ধুদ্বীপ তপস্যারত ঋষিকে মহিষ বেশে ভয় দেখিয়েছিল। তখন ঋষি তাকে 'মহিষী হও' বলে অভিশাপ প্রদান করেন। সেই মাহিষ্মাতীর গর্ভে মহিষাসুরের জন্ম হয়। দেবী ভাগবতে এইরূপ বর্ণনা রয়েছে-মনুর দুই পুত্র রম্ভ ও করম্ভ অমরত্বলাভের জন্য কঠোর তপস্যা করে। করম্ভাসুর নদীর জলে দাঁড়িয়ে তপস্যাকালে দেবরাজ ইন্দ্র কুম্ভীররূপে করম্ভাসুরকে নিহত করে। কারণ করম্ভাসুর তপস্যায় উত্তীর্ণ হয়ে যদি স্বর্গ রাজ্য দখল করে। ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদে রম্ভাসুর ব্যথিত হয়ে কঠোর তপস্যা শুরু করে এবং ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে অমরত্ব বর প্রদান করেন। রম্ভাসুর এক সুন্দরী মহিষীকে বিবাহ করে। সেই পত্নির গর্ভে এক বীর্যবান পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। মহিষীর গর্ভের জন্ম হয়েছে এবং পিতা অসুর বলে পুত্রের নামকরণ করা হয় 'মহিষাসুর'। মহিষাসুরও ব্রহ্মার নিকট হতে বর লাভ করেছিল "কোন পুরুষ তাকে হত্যা করতে পারবেনা" ।

মহিষাসুর এক সময় স্বর্গরাজ্য লাভ করার বাসনায় উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে এবং তার অসুর সৈন্যদের নিয়ে স্বর্গরাজ্য আক্রমন করে ফলে অসুর ও দেবতাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংগঠিত হয়। ব্রহ্মার অমরত্ব বরহেতু দেবতারা মহিষাসুরকে বধ করতে সক্ষম হলেন না। তাই দেবতাগণ পরাজিত হয়ে স্বর্গরাজ্য হতে পলায়ন করলো। মহিষাসুরও স্বর্গরাজ্যে তার অসুর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে, অন্যান্য দেবতাদেরও স্বর্গরাজ্য হতে বিতারিত করল।

এইভাবে মহিষাসুর কর্তৃক পরাজিত হয়ে দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করে দেবাদিদেব শিব ও বিষ্ণুর সমীপে গমণ করলেন। দেবতাগণ বিস্তারিতভাবে দেবাদিদেব শিব ও ভগবান বিষ্ণুর নিকট মহিষাসুর কর্তৃক স্বর্গরাজ্য আক্রমন ও যুদ্ধে পরাজয়ের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। দেবতাগণ প্রার্থনা করলেন- হে ভগবান আমরা আপনার শরণাগত্ আপনি আমাদের পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা। আমরা মহিষাসুর কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি এবং এই পৃথিবীতে মানুষের মতো বিচরণ করতে বাধ্য হয়েছি। তাই কৃপাপূর্বক মহিষাসুরকে বধ করে আমাদের রক্ষা করুন!

ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণের মুখে সকল কথা শুনে ভগবান বিষ্ণু ও দেবাদিদেব শিব ক্রদ্ধ হলেন এবং তাঁদের ভ্রু-কুঞ্চনে মুখমণ্ডল ভীষণাকার ধারণ করল। ভগবান বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মার বদন হইতে মহাতেজ নিঃসৃত হল। ভগবান বিষ্ণু হতে সত্ত্বগুণ, ব্রহ্মা হতে রজঃগুণ ও শিব হতে তমঃগুণ প্রকাশিত হল। এই তিনগুণের সমষ্টিতে প্রকটিত হলেন দেবী দুর্গা। মহিষাসুর যেহেতু বরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন কোন পুরুষ তাকে বধ করতে পারবে না। তাই তিনগুণের সমন্বয়ে সৃষ্টি করলেন অষ্টাদশভূজা দেবী দুর্গা। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্থী তিথীতে হিমালয়ের সুউচ্চ শিখরে মহর্ষি ক্যাত্যায়নের আশ্রমে আবির্ভূতা হন। দেবতারা বিভিন্ন দিব্য রত্নালংকারে ও পোশাকে দেবীকে সজ্জিত করলেন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন রকমের অস্ত্র দান করলেন। সিংহের উপর আরূঢ়া দেবীর অঙ্গ হতে দিব্যজ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল

এবং দেবীকে অত্যন্ত রূপমরী দেখাচ্ছিল। দেবী দুর্গা মহিষাসুরের সম্মুখে উপনিত হলেন। মহিষাসুর দেবীর রূপ দেখে আকৃষ্ট হলেন, দেবীকে ভোগ করার অনভিলসিত প্রয়াস করল। অসুরবুদ্ধি, জড়াসক্ত ও দেহাত্মবুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত অসুরগণ সর্বদা তাদের জড় ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধণের জন্য ব্যস্ত। জগতের সমস্ত অর্থ, ঐশ্বর্য ও সব নারীগণ যেন তাদের ইন্দ্রিয়ের ভোগের জন্য ব্যবহার করতে ব্যস্ত। দেবী দুর্গাও ঘোষণা করলেন হে মুর্খ, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে যদি আমাকে পরাজিত করতে পারিস তাহলে তোর ইচ্ছা পূরণ করব। দেবী আরও ঘোষণা করেছিলেন যে আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারবে আমি তাকে পতি হিসাবে বরণ করব।

সুতরাং মহিষাসুর দেবীকে পরাজিত করে তাঁর পাণি গ্রহণ করবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল। সে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হল। যার বর্ণনা দেবী ভাগবতে বিস্তারিতভাবে রয়েছে। মহিষাসুরের মন্ত্রিগণ, বাস্কল, দুর্মর্ষ, তাম্র, চিক্ষুর, অসিলোমা ও বিড়াল সকলেই যুদ্ধে নিহত হল। অবশেষে মহিষাসুর স্বয়ং দেবীর সম্মুখে যুদ্ধের জন্য আবির্ভূত হল। মহিষাসুর দেবীর প্রতি বাণের বৃষ্টি নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করল। আর দেবী সেগুলিকে তাঁর বাণের দ্বারা প্রতিরোধ করল। দেবী ত্রি-নয়না- চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি এই তিনটি তাঁর চক্ষু। তাই দেবী সর্বদা সকল অসুরগণের কার্যকলাপ দর্শন করলেন। অবশেষে দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে তাঁর বিষ্ণু থেকে প্রাপ্ত বিষ্ণু চক্র অস্ত্র দ্বারা আক্রমণ করল। এই চক্রের দ্বারা তার গলা ছেদন হওয়া মাত্রই ভূমিতে নিপতিত হল এবং মৃত্যু বরণ করল। সকল দেবতাগণ পুষ্প বৃষ্টি ও জয়ধ্বনি দিতে থাকে। দশমী তিথিতে মহিষাসুরকে বধ করার ফলে দেবতাগণ স্বর্গ রাজ্য ফিরে পেলেন। এই দশমী তিথিকেই বলা হয় "বিজয় দশমী "। তাই ভুবন পূজিতা দেবীর যুদ্ধরতা অবস্থার প্রতিমূর্তি প্রতি বছর জাঁকজমক সহকারে ভারত বর্ষের সর্বত্র পুজিত হচ্ছেন।

এই দুর্গার মূল স্বরূপ ভগবৎ রাজ্যে যে চিন্ময়ী দুর্গা অধিষ্ঠিতা আছেন তিনি হলেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি, মায়াংশভূতা দুর্গা নন। দুঃখে অর্থাৎ গুরু আরাধনাদি প্রয়াস স্বীকারে গমণ হয় যাঁর তিনি দুর্গা। যিনি সর্বশ্রেষ্ঠা তিনিই মাত্র কান্ত শ্রীকৃষ্ণকে সম্পূর্ণরূপে জানেন। সেই তদ্‌গত চিন্তা প্রকৃতিকে 'দুর্গা' বলা হয়। তিনিই পরাৎপরা মহাবিষ্ণু স্বরূপিনী শক্তি ইত্যাদি। এই অখণ্ডরসবল্লভা পরম প্রকৃতিকে অতি দুঃখেই জানা যায় বলে ইনি 'দুর্গা'। এর আবরিকা শক্তির বা ছায়া-শক্তির নাম-মহামায়া, অখিলেশ্বরী; তাঁর মায়াতে নিখিল জগৎ ও দেহাভিমানী বদ্ধ জীব সমূহ মুগ্ধ হয়ে রয়েছে।

এই জড় জগৎ হচ্ছে চিন্ময় জগতে বিকৃত প্রকাশ যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা নিকৃষ্টা মায়াশক্তি বা জড়া প্রকৃতির রচিত। আর এই বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রতিমূর্তি বা অধিষ্ঠাত্রী দেবী ;'দুর্গা। এই দুঃখময় জড় জগৎকে বলা হয় কারাগৃহ বা দুর্গ; আর এই দুর্গের কারারক্ষীকে বলা হয় 'দুর্গা'।

এই জড় জগতের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাঁর ব্রহ্মসংহিতায় -'দুর্গা' সম্বন্ধে বলেছেন-

সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

'স্বরূপ শক্তি বা চিৎ-শক্তির ছায়া-স্বরূপা এই জড় জগতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সাধনকারিনী মায়া শক্তিই ভুবন পূজিতা 'দুর্গা'; তিনি যাঁর ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

প্রজাপতি ব্রহ্মা ভগবৎ উপলব্ধি করে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনাকালে এই জড় জগৎ বা দেবী ধামে অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গার কার্যাবলী বর্ণনা করেছেন। যে জগতে ব্রহ্মা অবস্থিত হয়ে গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেছেন সেই জগৎ চৌদ্দ ভুবন যুক্ত দেবী ধাম, তার অধিষ্ঠাত্রী 'দুর্গা'। তিনি দশ কর্মরূপ দশভূজা; বীর প্রতাপে অবস্থিত বলে সিংহবাহিনী, পাপদমনীরূপ মহিষাসুর মর্দিনী, শোভা ও সিদ্ধিরূপ সন্তানদ্বয় বিশিষ্টা বলে কার্তিক ও গণেশের জননী, পাপদমনে বহুবিধ বেদোক্ত ধর্মরূপ বিংশতি অস্ত্র ধারিনী। তিনি মাতৃরূপী বলে 'প্রকৃতি' তাই তিনি জগৎ মাতা নামে খ্যাত।

'দুর্গ' শব্দের অর্থ কারাগৃহ। চিদ্‌জগতে হলে যে জড় জগৎরূপ কারায় আবদ্ধ হয়। তাই দুর্গার 'দুর্গ'। জেলখানায় যে রূপ দুষ্কৃতিকারী ব্যক্তিগণকে সংশোধন করার জন্য এই জগতের কর্মচক্রে নিয়োজিত করে। দুর্গা দেবী ও সেইরূপ কৃষ্ণবিমুখ বদ্ধ জীব সমূহকে সংশোধন করার জন্য এই জগতের কর্মচক্রে নিয়োজিত করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ও তাঁর নিত্য দাসীরূপে দুর্গাদেবী এই কার্য্য সম্পাদন করে থাকেন।

শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখ আছে মধ্যঃ ২০/১০৮-১১৭

জীবের 'স্বরূপ হয়-কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থাশক্তি' 'ভেদাভেদ প্রকাশ' ॥
কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ ॥

জীব যখন স্বরূপ বিস্মৃত হয় এবং ভগবানের দাসত্বের কথা ভুলে নিজের ভোগ করার ইচ্ছা প্রবল হয় তখনই জীব এই জগৎ রূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয় এবং দুর্গামাতার নিয়ন্ত্রণাধীন ত্রিগুণের দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করে জন্ম-জন্মান্তরে ধরে দুঃখ কষ্ট ভোগ করে থাকে।

তাইতো কখনও কখনও এই সমস্ত জীব সমূহ জগন্মাতার পুজা ও স্তব-স্তুতি করে থাকে যাতে করে এই জড় জগৎ রূপ কারা হতে মুক্ত হতে পারে। কিন্তু তাঁদের অজ্ঞানতা বশতঃ যথার্থ সাধন পন্থা অনুসরণ না করে বিকৃত পন্থা গ্রহণ করে।

যিনি জগন্মাতা হিসাবে সকলের পুজনীয়, কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, **বর্তমান সময়ে দেখা যায় সেই পুজা মণ্ডপে জগন্মাতার সম্মুখে মদ, গাজা, নেশা, ভাং খেয়ে বিকৃত অঙ্গভঙ্গিতে নৃত্য করছে। এমনকি অশোভন গান বাজনা দ্বারা মন্দির অঙ্গণকে কলুষিত করে তুলছে।** যিনি জগন্মাতা অবশ্যই তাঁর সম্মুখে আমাদের শোভনীয় আচরণ করা উচিত। তাহলে সেই জগন্মাতা আমাদের এই কারা হতে মুক্ত হওয়ার জন্য সাহায্য করতে পারেন।

জীবের কলুষিত বাসনাকে অবশ্যই পরিশুদ্ধ করে তারপর মায়ের চরণে প্রার্থনা জানাতে হবে। দুর্গাদেবী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলায় সহযোগীতা করেন মাত্র, তিনি মুক্তি প্রদাতা নয়। তাই তিনি মুক্তি প্রদাতা মুকুন্দের চরণের বন্দনায় তাঁর সেবায় সর্বদা যুক্ত। তাই তিনি পরমা বৈষ্ণবী দেবী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ (গীতা ৭/১৪)

আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তা দুরতিক্রমণীয়া। কিন্তু যারা আমাতে প্রপত্তি স্বীকার করেন তাঁরাই এই মায়া হতে উত্তীর্ণ হতে পারেন।

শ্রীভগবানকে নারদের অভিশাপ

-শ্রী গৌরকিশোর দাস ব্রহ্মচারী

লীলাময় ভাগবান শ্রীহরি একাধিকবার অভিশাপের শিকার হন। এক কল্পে জলন্ধর দৈত্যের উপদ্রবে দেবতারা নাজেহাল। তখন শিব গেলেন যুদ্ধ করতে। তিনিও জলন্ধরকে পরাজিত করতে পারেননি। কারণ জলন্ধরের স্ত্রী ছিল সতী সাধ্বী নারী। তখন শ্রীহরি ছল করে জলন্ধরের স্ত্রীর সতীধর্ম নষ্ট করেন। সেই নারী যখন ভগবানের ছলনা বুঝতে পারলেন, তিনি তখন ভগবানকে অভিশাপ দেন।

আরেকবার শঙ্খচূড় নামক অসুরও তাঁর স্ত্রী তুলসীর জন্য অবধ্য ছিলেন। দেবলোকের মঙ্গলের জন্য তিনি তুলসীর সতীত্ব হরণ করেন। তুলসী ছিলেন ভগবদ্ভক্ত। কিন্তু ভগবানের ছলনা বুঝতে পেরে তিনিও শ্রী হরিকে পাষাণ রূপ প্রাপ্তের জন্য অভিশপ্ত করেন। ভগবান তা-ই শিরোধার্য করে নারায়ণ শিলাতে পরিণত হলেন। উপরন্তু, তুলসীর ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্যের জন্য তিনি জন্মে জন্মে শ্রীভগবানের শ্রীচরণ কমলে স্থান পান।

কিন্তু যদি শোনা যায় যে, দেবর্ষি নারদ ভগবানকে অভিশাপ দিয়েছেন! তাহলে চমকে উঠতে হয়। কিন্তু ঘটনা তাই। নারদ দক্ষ কর্তৃক 'যাযাবর' বৃত্তির অভিশাপ পেয়েছিলেন। হিমালয়ের গঙ্গার তীরে এক মনোরম আশ্রম দেখে নারদের ভালো লাগল। তিনি পর্বত-নদী-কান্তারের অনবদ্য দৃশ্য অবলোকন করে রমাকান্ত ভগবানের শ্রীচরণে অনুরাগ জন্মাল। শ্রীচরণ স্মরণ হওয়াতেই তিনি শাপমুক্ত হলেন। তারপর সেই মনোমুগ্ধকর আশ্রমে তিনি সমাধিস্থ হলেন।

নারদের এই সমাধি দেখে ইন্দ্রের ভয় হল। তিনি ভাবলেন, নারদ হয়তো তপোবলে তাঁর ইন্দ্রত্ব (স্বর্গের রাজপদ) কেঁড়ে নেবেন। ইন্দ্র কামদেবকে আদেশ করলেন, "যাও! তোমার সঙ্গী-সাথী নিয়ে দেবর্ষি নারদের সমাধি ভঙ্গ করো।" মীন কেতু কামদেব "যথা আজ্ঞা" বলে তাঁর আদেশ পালনের জন্য তৎপর হলেন।

মদন সেই আশ্রমে বসন্ত সৃষ্টি করলেন। নানা রঙের ফুল ফুটল। কোকিল গান গাইল। ভ্রমর গুঞ্জন করল। শীতল মৃদু -মন্দ সুগন্ধি বাতাস বইল। উর্বশী, রম্ভা প্রমূখ অপ্সরাগণ নানা ভঙ্গিতে শরীর আন্দোলিত করে নৃত্য পরিবেশন করল। চির যুবতী দেব ললনাদের লাস্যময়ী দেহ - বল্লরী আন্দোলিত হল। কামকলায় নিপুণ অপ্সরাদের ছলা-কলায় নারদের সমাধি ভঙ্গ হল না। তখন তারা অভিশাপের ভয় পেল। সকলে দেবর্ষি নারদের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করল। নারদ সকলকে ক্ষমা করে দিলেন।

দেবর্ষি নারদের এই ঘটনায় খুব অহঙ্কার হল। তিনি কৈলাসে গিয়ে শিবকে বেশ গর্বের সঙ্গে এই ঘটনা বর্ণনা করলেন। শিব বললেন, আপনি এটা যেভাবে আমাকে বর্ণনা করলেন, তা কখনও ভগবান শ্রীহরিকে বলবেন না। কিন্তু নারদের শিবের উপদেশ ভালো লাগল না। তিনি বীণায় হরি গুণগান করতে করতে ক্ষীরসমুদ্রে গেলেন, যেখানে শ্রীহরি নারায়ণ রূপে বাস করেন।

নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে আপ্যায়ন করে বসিয়ে কুশল বিনিময় করলেন। দেবর্ষি নারদ হল শ্রী ভগবানের পরম ভক্ত। কিন্তু ভগবান তো অন্তর্যামী। তবুও গর্বের সঙ্গে নারদ কামদেবের পরাজয়ের ঘটনা নারায়ণকে বললেন। নারায়ণ বললেন, "তোমাকে স্মরণ করলেই অন্যের কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ দূরীভূত হয়ে যায়। তো কামদেব পরাজিত হয়েছে– এটা আর এমন কি কথা? একথা শুনে নারদের আরও অহঙ্কার বৃদ্ধি পেল। তারপর নারদ বিদায় নিলেন। তখন শ্রীনারায়ণ অপূর্ব এক লীলা করলেন। তিনি ভক্ত নারদের মঙ্গলের জন্য তাঁর মায়াশক্তিকে নির্দেশ দিলেন নারদকে মোহিত করতে।

নারদ দেখলেন এক অপূর্ব নগর, যেখানে সুন্দর সব নর-নারী বাস করছে। সবাই যে মদন আর রতি। সেই নগরের রাজা শিলানিধি। বিশাল তাঁর সামরিক সজ্জা। প্রচুর ভোগৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ সেই নগর। নারদ পুরবাসীদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে, রাজকন্যা বিশ্বমোহিনীর স্বয়ম্বরা হবে। সেই উপলক্ষে বহু রাজা রাজবাড়িতে সমাগত। নারদও তামাসা দেখতে গেলেন। রাজা শিলানিধি নারদকে পাদ্যার্ঘ্য দিয়ে পূজা করলেন। তারপর রাজকন্যাকে দেখিয়ে এর দোষ-গুণ বিচার করতে বললেন। নারদ বিশ্ববিমোহিনীর অপরূপ সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়ে গেলেন। রাজাকে শুধু বললেন, এই কন্যা সুলক্ষণা। আর মনে মনে নারদ চিন্তা করলেন, এই কন্যার পাণি গ্রহণ যে করবে সে ত্রিলোকে পূজিত হবে। তাকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না। অতএব, এই কন্যাকে পাওয়ার জন্য নারদ চিন্তা করতে করতে বাইরে এলেন। নারদ এতটাই মোহগ্রস্ত হলেন যে, তিনি স্বয়ং শ্রীহরিকে স্মরণ করলেন। ভগবানকে স্মরণ মাত্রই তিনি উপস্থিত হলেন। নারদ বললেন, "ভগবান, এই কন্যাকে আমার চাই-ই চাই। আর সেজন্য তোমার রূপ আমাকে দাও।" ভগবান বললেন, "তথাস্তু"।

যথাসময়ে স্বয়ম্বর সভা শুরু হল। শিব তাঁর দুইজন অনুচরকে নারদের কাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতে ব্রাহ্মণের বেশে পাঠিয়েছিলেন। ভগবান স্বয়ং-ও রাজবেশ ধারণ করে উপস্থিত। বিশ্ববিমোহিনী নারদের দিকে দৃষ্টিপাতই করলেন না। স্বয়ং ভগবানকে বরমাল্যে বরণ করলেন। এই দৃশ্য দেখে নারদ ক্রোধে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। এদিকে রাজবেশধারী ভগবান বিশ্ববিমোহিনীকে নিয়ে চলে গেলেন। নারদের অস্থির মতি লক্ষ্য করে শিবের অনুচর বলল, "ঠাকুর, দর্পণে একবার নিজের মুখটা দেখ।" নারদ তখন স্থির জলে নিজ প্রতিবিম্ব দেখে আঁতকে উঠলেন। আরে! এ-তো বাঁদরের মুখ। নারদ ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। নারদ অহর্নিশি যাঁর নাম গুণগান করে, সেই পরমেশ্বর কিনা নারদকে ছলনা করলেন! তিনি তক্ষুণি বৈকুণ্ঠের দিকে ছুটলেন। পথেই শ্রী ভগবানের দর্শন পেলেন। সঙ্গে লক্ষ্মী এবং বিশ্ববিমোহিনী। নারদ ক্রোধে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "তুমি পরের ভালো দেখতে পার না। তুমি হিংসুক! কপট! সমুদ্র মন্থনে উৎপন্ন বিষ তুমি সরলমতি শিবকে পান করিয়েছিলে। আর কৌস্তভমণি ও লক্ষ্মীকে নিয়ে তুমি বৈকুণ্ঠে চলে গেলে। তোমার মতো কুটিল স্বভাব ও স্বার্থপর আর দ্বিতীয় কেউ নেই। তোমাকে শাসন করার কেউ নেই। তাই যা ইচ্ছা তা-ই কর। আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, যে বিরহে আমি জ্বলছি, সেই বিরহে তুমিও কাতর হবে। আর যে মর্কট মুখ আমাকে দিয়ে ছলনা করেছ, সেই বাঁদরই তোমার সহায়তাকারী বন্ধু হবে। শ্রীভগবান ভক্তের অভিশাপ মাথা পেতে নিলেন। আর তখনই নারদের উপর আরোপিত মায়াজাল অপসারিত করলেন। নারদ সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখলেন, লক্ষ্মী বা বিশ্ববিমোহিনী কেউ কোথাও নেই। নারদ অপরাধ বুঝতে পেয়ে শ্রীভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। ভগবান বললেন, "তুমি শ্রীশঙ্করের শরণ নাও, তাহলে শান্তি পাবে। যাও, আমি রাম অবতারে পৃথিবীতে লীলা করবো। সীতা বিরহে কাতর হব এবং বানর সেনার সাহায্যে সীতা উদ্ধার করব। তুমি আমার পরম ভক্ত, তোমার অভিশাপের মর্যাদা আমি রাখব। তোমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই তোমার অহঙ্কার চূর্ণ করার জন্যই আমি মায়ার দ্বারা তোমাকে মোহাচ্ছন্ন করেছিলাম।"

(উৎস: রামচরিত মানস)

(৫ পৃষ্ঠার পর)

অন্তিম কারণ অনুসন্ধানেই ব্রতী হয়ে থাকে, তারাও পরম উৎসের অনুসন্ধানে প্রয়াসী, তবুও দেখা যায় যে, তাদের পন্থাও সেই একই- 'এটা নয়, সেটা নয়।' এইভাবে ব্যর্থ অনুসন্ধানে যতই তারা এগুতে থাকুক, তাদের সিদ্ধান্ত সব সময়েই সেই একই-"নেতি নেতি"- এটা নয়, সেটা নয়। কিন্তু অন্তিম কারণ, পরম উৎসকে তারা কখনই নির্ণয় করতে পারে না। ওভাবে তারা পারবেও না।

কৃষ্ণ-দর্শন তো দূরের কথা, জড়বাদী বিজ্ঞানীরা জড় বস্তুকে যথাযথভাবে বুঝে উঠতে পারেনি আজও। তারা চাঁদে অভিযানের চেষ্টা করছে, আসলে চাঁদের স্বরূপই তারা জানে না। বাস্তবিকই যদি তারা চাঁদকে বুঝতে পারত, তা হলে চাঁদ থেকে ফিরে এল কেন? তত্ত্বগতভাবে তারা চাঁদের স্বরূপ বুঝতে পারলে, ইতিমধ্যেই ওরা সেখানে বসবাস শুরু করে দিত। বিগত ত্রিশ বছর যাবৎ তারা চেষ্টা করে চলছে সেখানে গিয়ে থাকবে, কিন্তু এখনও মন্তব্য করছে, 'এটা নয়, ওটা নয়। ওখানে কোন জীব নেই। ওখানে বসবাস সম্ভব নয়।' এইভাবে তারা তথ্য জানাতে পারে: চাঁদে কি নেই। কিন্তু চাঁদে কি নেই, চাঁদে বাস্তবিক কি আছে, সে সম্পর্কে তারা কী জানে? না, তাদের তা জানা নেই। আর এই চন্দ্র হচ্ছে শুধুমাত্র একটি উপগ্রহ।

বৈদিক শাস্ত্র মতে চন্দ্র হচ্ছে একটি নক্ষত্র। ...ভগবদগীতায় (১০/২১) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন, 'নক্ষত্রাণাম্ অহংশশী': "নক্ষত্রদের মধ্যে আমি শশী"। ...শ্রীকৃষ্ণই এসব সৃষ্টি করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের এইসব সৃষ্টিকেই আমরা আজও যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি তো শ্রীকৃষ্ণকে কেমন করে বুঝব? শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করা আদৌ সম্ভব নয়।

এই জন্যই বৃন্দাবন-মনোভাবই হচ্ছে ভগবদ-ভক্তের মনের প্রকৃষ্ট অবস্থা। শ্রীকৃষ্ণ উপলব্ধিতে ব্রজবাসীদের আগ্রহ নেই, তাঁরা শুধু নিঃশর্তভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতেই চান। এমন নয় যে, তাঁরা মনে করেন- "শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, তাই তো আমরা তাঁকে ভালবাসি।" বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের ভূমিকা পালন করেন না। ব্রজধামে তিনি এক সাধারণ গোপবালকের ভূমিকাই গ্রহণ করেছিলেন এবং মাঝে মাঝে তাঁর ভগবত্তা প্রকটিত করা সত্ত্বেও, ভক্তেরা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা জানতে আগ্রহী নন।

এই জন্য শ্রীকৃষ্ণকে শুধু ভালবাসাই আমাদের উদ্দেশ্যে আর আগ্রহ হওয়া বাঞ্ছনীয়। যতই আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসব, ততই আমাদের সার্থকতা আসবে। অনেক বেশি পরিমাণে কৃষ্ণতত্ত্ব উপলব্ধিতে মনোনিবেশ করার দরকার নেই- তা সম্ভবও নয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বুঝিয়েছেন, তার বেশি কিছু জানবার চেষ্টা করা আমাদের উচিত নয়। শুধুই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অনন্য, অকৃত্রিম অনুরাগ বাড়িয়ে তুলতে হবে আমাদের। এইখানেই আমাদের জীবনের পূর্ণ সার্থকতা। এইখানেই জীবনের পরম সিদ্ধি। অনেক ধন্যবাদ

কলিকালের কথা

-শ্রী সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

বৃহন্নারদীয় পুরাণে ৩৮ অধ্যায়ে কলির মানুষের অবস্থা বর্ণিত আছে। শ্রীল সুত গোস্বামী মুনি-ঋষিদের সম্মুখে কলিকাল প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন, কলিকালে প্রায় ধর্মাত্মা ব্যক্তি থাকবে না। যদি কেউ ধর্মগত থাকে, তবে তাকে দেখে অন্যরা অসূয়া প্রকাশ করতে থাকবে। অধর্মের প্রভাবে ব্রত, দান, যজ্ঞ অনুষ্ঠান ইত্যাদি উপদ্রুত হবে। লোকেরা ঈর্ষা পরায়ণ হবে। দম্ভপরায়ণ হবে। লোকেদের আয়ুষ্কাল অল্প। কালিকালে ব্রাহ্মণ শাস্ত্র অধ্যয়ন বা বৈদিক আচরণ করবে না। প্রচণ্ড লোভী হবে। তারা শূদ্রের দাসত্ব করবে। মাছ-মাংস আহার কেবল নিষাদ বা চণ্ডাল শ্রেণীই নয়, কলিযুগের প্রায় মানুষই মাছ খাবে, পশু-পাখির মাংস খাবে, ডিম খাবে। দুধ খাওয়ার উদ্দেশ্যে ছাগল ও ভেড়া দোহন করবে।

কলিকালের প্রথম ভাগেই মানুষেরা হরি নিন্দা করতে থাকবে। কলিকালের শেষ ভাগে কেউই হরিনাম স্মরণ করবে না। দুরাত্মা ব্যক্তিরা পরান্ন ভোজী হয়ে আজেবাজে কথাকে ধর্মকথা বলে শোনাবে এবং কাপালিক-ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবে। মানুষ অল্পবিত্ত হলেও বৃথা অহংকারী হবে, পরদ্রব্য অপহরণ করতে চেষ্টা করবে, কাউকে কিছু দান করতে চাইবে না। মানুষের মুখের ভাষা জঘন্য হবে। বহু লোকের সঙ্গে কলহ বিবাদ লাগিয়ে রাখবে।

কলিকালের শেষ ভাগে মানুষের পরমায়ু হবে ষোল বছর। পাঁচ বছরের মেয়েরা সন্তানের মা হবে। সাত বছরের ছেলেরা সন্তানের বাবা হবে। বিবাহ যজ্ঞ অনুষ্ঠান থাকবে না। মানুষ খল চরিত্র হবে। প্রতিদিন পরনিন্দা, মিথ্যা অপবাদ নিয়েই থাকবে। কখনও কখনও কথায় কথায় ধর্ম প্রকাশ করলেও মনে মনে পাপ চিন্তাই করতে থাকবে।

মানুষ সর্বদা ব্যাধি, চুরি, দুর্ভিক্ষ, নানা প্রকার দুঃখে পীড়িত হবে। বিদ্যা ধন ও যৌবন-মদে মত্ত ও কপটাচারী হবে। বিনাদোষে অপরকে দ্বেষ করবে এবং সযত্নে নিজের দোষ গোপন করবে। সব শ্রেণীর মানুষই অত্যন্ত কামাসক্ত হয়ে বিভিন্ন জনের পত্নীতে আসক্ত হয়ে পড়বে। মানুষের মস্তিষ্কে তখন শিষ্য, গুরু, পুত্র, পিতা, ভার্যা পতি-কিছুই বিবেচনা থাকবে না। কামিনীকুলও বদচরিত্রা হবে। কলিকালে সর্বধর্ম বিলুপ্ত হবে। জগতের আর শ্রী থাকবে না।
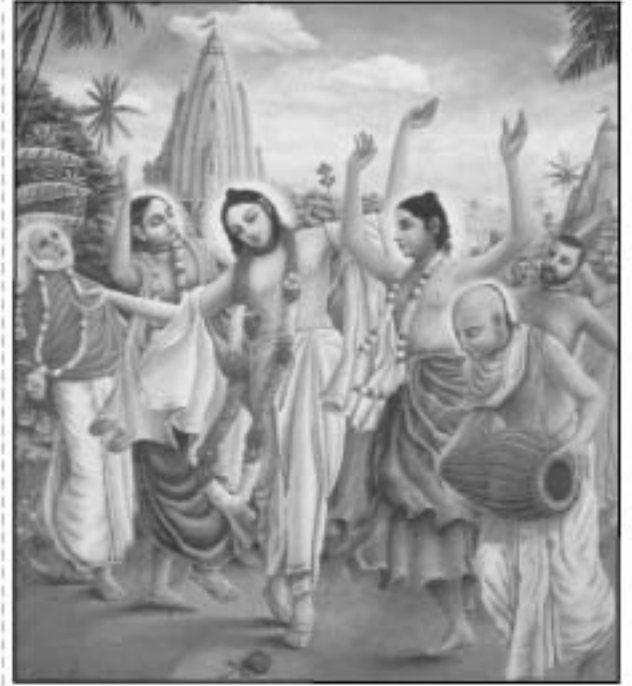
কিন্তু হে সন্তগণ, এই কথাটি জেনে রাখুন যে, কলিযুগে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পাপময় হলেও, কলি কালে হরিভক্তি পরায়ণ ব্যক্তিদের কখনও কলি কোনও অনিষ্ট করতে পারবে না। কলিকালের অতীব সুন্দর মাহাত্ম্য রয়েছে।

সত্যযুগে দশ বছর ধরে ধ্যান তপস্যা করে যে ফল লাভ হয়, ত্রেতাতে এক বছর ধরে যাগযজ্ঞ করে সেই ফল লাভ হয়, দ্বাপরে এক মাস শ্রীবিগ্রহ পূজা-অর্চনা করে সেই ফল লাভ হয়, এবং কলিযুগে মাত্র একদিন হরিনাম করে সেই ফল লাভ করা যায়। কলিকালে যে মানুষ একদিন দিবারাত্রি হরিনাম সংকীর্তন ও হরিপূজা করে, তাদের কলিভয় থাকে না। হে সাধুগণ! ঘোর কলিযুগে যে সমস্ত মানুষ হরিনামে আসক্ত, তারাই ধন্য হয়ে থাকে। তাদের আর কলির দিক থেকে ভয় নেই। শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত ব্যক্তি কখনও অবসাদগ্রস্ত হন না। শ্রীকৃষ্ণ তাদের অখিল পাপরাশি দূর করে দেন। হরিভজনশীল ব্যক্তিরাই মহাভাগ্যবান। হরিনাম নিয়ে থাকাই কলিজীবের উদ্ধারের একমাত্র পন্থা।

একাদশীর তত্ত্ব ঃ একটি গবেষণামূলক বিশ্লেষণ

-শ্রী মনোরঞ্জন দে

(পূর্ব প্রকাশের পর)

পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশী নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ দিক হল এই মহাদ্বাদশীর আগের একাদশী দশমী দিন অর্দ্ধরাত্রি থেকে আরম্ভ হবে। স্মার্ত্ত মতে লিখিত বেশীরভাগ পঞ্জিকার ব্যবস্থাপকগণ এদিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাই বাংলাদেশে প্রচলিত পঞ্জিকাগুলি থেকে পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশীর কোন উদাহরণ দেয়া সম্ভব হলো না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় উন্মীলনী ব্যঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা এবং পক্ষবর্দ্ধিনী-এই চারটি মহাদ্বাদশী কেবলমাত্র তিথির ক্ষয়-বৃদ্ধি অনুসারে সংঘটিত হয়।

আবার দ্বাদশীর সাথে বিশেষ বিশেষ নক্ষত্রযোগে আরো চারটি মহাদ্বাদশী আছে। এদেরকে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী এবং পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী বলে। শ্রী হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থে বলা হয়েছে-

পুষ্য-শ্রবণ-পুষ্যাদ্য রোহিনী সংযুতাস্তু তাঃ।
উপোষিতাঃ সমাফলা দ্বাদশ্যোহষ্টৌ পৃথক্ পৃথক্ ॥

=> অর্থাৎ দ্বাদশীর সাথে পুষ্যা, শ্রবনা, পুনর্ব্বাসু এবং রোহিনী নক্ষত্রের যোগ হলে যথাক্রমে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী এবং পাপনাশিনী এই চারটি মহাদ্বাদশী হয়। একই গ্রন্থে বলা হয়েছে যদি দ্বাদশীর সাথে পুষ্যা, শ্রবনা, পুনর্ব্বসু এবং রোহিনী নক্ষত্রের সূর্যোদয় কাল থেকে যোগ হয় এবং ঐ সব নক্ষত্র দ্বাদশী অপেক্ষা অধিক, দ্বাদশীর সমান অথবা দ্বাদশী অপেক্ষা কম সময়কাল স্থায়ী হয়, তবে ঐ দ্বাদশীতে মহাদ্বাদশীব্রত হবে। বিকল্পভাবে সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে নক্ষত্র আরম্ভ হয়ে যদি দ্বাদশীর সমানকাল অথবা বেশী কাল পর্যন্ত স্থায়ী হয় তাহলেও মহাদ্বাদশী ব্রত হবে।

উল্লেখ্য যে নক্ষত্রযোগে মহাদ্বাদশী নির্ধারণের ব্যাপারে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে অনেককাল আগে থেকেই মতদ্বৈততা পরিলক্ষিত হয়। একদল বলেন-সূর্যোদয় কাল অথবা তার পূর্ব থেকে নক্ষত্র আরম্ভ হয়ে দ্বাদশী অপেক্ষা কম, বেশী অথবা দ্বাদশীর সমানকাল পর্যন্ত থাকলে ব্রত হবে। অন্যদল বলেন-নক্ষত্র দিন মানের সমান অর্থাৎ ৬০ দণ্ড। তার চেয়ে বেশী অথবা কম হলে ব্রত হবে। এই দুই মত অনেকদিন ধরেই বর্তমান আছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন মীমাংসা হয় নাই।

নক্ষত্রের সময়কাল ৬০ দণ্ডের সমান, বা কম অথবা বেশী থাকলে ব্রত হবে-এই শেষোক্ত মতের একটু বিশেষ সুবিধা হল যে এই ব্যবস্থার অধীনে মহাদ্বাদশী বেশী খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই উপবাসের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে আর কি। প্রথম মত আশ্রয় করলে কিছু বেশী উপবাস করতে হয়। এই অসুবিধা আছে মাত্র।

উল্লেখ্য যে পুষ্যা, পুনর্ব্বসু এবং রোহিনী নক্ষত্রযোগে মহাদ্বাদশী হলে সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত দ্বাদশী থাকা চাই। সূর্যাস্তের আগে দ্বাদশী শেষ হলে ব্রত হবে না। তবে শ্রবনা নক্ষত্র যোগে ব্রত হলে সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত দ্বাদশী না থাকলেও চলে।

উদাহরণ ঃ (১) লোকনাথ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা ১৪১৩ বাংলা এর ৩০৮ পৃষ্ঠায় সোমবার ২৯/১/২০০৭ইং লক্ষ্য করুন। এই দিন দিবা ১/১৫/২১ সেঃ গতে দ্বাদশী আরম্ভ হবে এবং পরদিন মঙ্গলবার ৩০/১/২০০৭ইং তারিখের দিবা ১২/৬/০৫ সেঃ পর্যন্ত থাকবে। রোহিনী নক্ষত্র ০/৩৮/৫ দণ্ডব্যাপী এবং এটি সোমবার প্রাতঃ ৭/৮/৯ সেঃ পর্যন্ত থাকবে। অর্থাৎ রোহিনী নক্ষত্র দ্বাদশী আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই শেষ হয়ে যাবে। দ্বাদশী তিথিটি শুক্লপক্ষে থাকলেও রোহিনী নক্ষত্র দ্বাদশীর সাথে সংযুক্ত না থাকায় এই দ্বাদশীতে মহাদ্বাদশীব্রত হবে না। এজন্য ২৯/১/২০০৭ইং সোমবারই একাদশী হবে।

উদাহরণ ঃ (২) একই পঞ্জিকার ১৬/৩/২০০৭ইং শুক্রবার লক্ষ্য করুন। দ্বাদশী আগের দিন বৃহস্পতিবার দিবা ৪/১৫/৪৭ সেঃ গতে আরম্ভ হয়ে শুক্রবার ২১/৩২/৪৫ দণ্ডব্যাপী অর্থাৎ দিবা ২/৫৬/৫৪ সেঃ পর্যন্ত আছে। দ্বাদশী সূর্যোদয় থেকে আরম্ভ হয়েই দিবা ২/৫৬/৫৪ সেঃ পর্যন্ত থাকবে। শ্রবনা নক্ষত্র শুক্রবার দিন ১২/৪৮/০৮ দণ্ডব্যাপী-অর্থাৎ সূর্যোদয় থেকে দিবা ১১/২৭/১৫ সেঃ ব্যাপী থাকবে। স্বভাবতই এখন কেউ বলতে পারে ১৬/৩/২০০৭ইং শুক্রবার দিন মহাদ্বাদশী ব্রত হবে। কিন্তু এটি শুক্লা দ্বাদশী নয়-অর্থাৎ শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথি নয়। ফলে একাদশী ব্রত ১৫/৩/২০০৭ইং বৃহস্পতিবারই হবে। কেবলমাত্র শুক্লাদ্বাদশী না হওয়ায় শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ থাকলেও ১৬/৩/২০০৭ইং শুক্রবার বিজয়া মহাদ্বাদশী ব্রত হবে না।

(চলবে)

শ্রীল গৌরগোবিন্দ স্বামী মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী

(A Brief Life Sketch Of Srila Gour Govinda Swami" Source: The Worship Of Sriguru)- গ্রন্থ থেকে অনূদিত

– ভাষান্তরঃ শ্রীমতি মীনাক্ষী রাধিকা দেবী দাসী

কৃষ্ণকৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজ ব্রজবন্ধু মানিক নাম ধারণ করে ১৯২৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর এক বৈষ্ণব পরিবারে আবির্ভূত হন। তিনি জগন্নাথ পুরী ধামের অনতিদূরে জগন্নাথপুর নামক একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সেই স্থানটি ছিল ভারত বর্ষের উড়িষ্যা প্রদেশে। কিন্তু তাঁর মাতা এসেছিলেন গদাইগিরি গ্রামের গিরি পরিবার থেকে। তাই ব্রজবন্ধু সেখানেই তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত করেন। তাঁর পিতামহ ছিলেন পরমহংস যাঁর একমাত্র কাজ ছিল গোপাল জিউ নামে পরিচিত স্থানীয় একটি মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের সমানে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা আর ক্রন্দন করা। তিনি ব্রজবন্ধুকে শিখিয়েছিলেন কিভাবে হাতে গুণে কৃষ্ণ নাম জপ করতে হয়। তিনি তাঁর মাতুলের সহচর্যে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র এবং নরোত্তম দাস ঠাকুরের ভজন কীর্তন গেয়ে গেয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। উড়িষ্যায় সুদক্ষ কীর্তনীয়া হিসেবে এই গিরি পরিবার শ্যামানন্দ প্রভুর সময় থেকেই বিখ্যাত ছিল। তিনশ বছর আগে উড়িষ্যার রাজা সরকারী ভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন যে- গদাইগিরির কীর্তন দল যখনই সম্ভব হবে তারা তখনই জগন্নাথ পুরীর মন্দিরে প্রভু জগন্নাথের জন্য কীর্তন করতে আসতে পারবে। উড়িষ্যায় তাদেরকে কীর্তন গুরু হিসেবে দেখা হতো।

ছয় বছর বয়স থেকে ব্রজবন্ধু বিগ্রহের জন্য মালা তৈরীর মাধ্যমে গোপাল জিউয়ের সেবা করতেন, আবার কখনো বা মোমবাতির আলোতে তালপাতায় রচিত পান্ডুলিপি থেকে ভগবানের উদ্দেশ্যে স্তব-স্তুতির মাধ্যমে। গোপালকে নিবেদন করা হয়নি এমন কোন খাদ্য দ্রব্যই তিনি গ্রহণ করতেন না। আট বছর বয়সের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত এবং চৈতন্যচরিতামৃত অধ্যয়ন করেছিলেন, এমনকি সেগুলোর অর্থও ব্যাখ্যা করতে পারতেন। রাত্রিবেলা অনেক গ্রামবাসী তাঁর কাছে ভাগবত রামায়ণ এবং মহাভারত থেকে আবৃত্তি শুনতে আসত। কাজেই জীবনের শুরু থেকেই তিনি কৃষ্ণ নাম জপ, বৈষ্ণব শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন এবং তাঁর প্রিয় গোপাল সেবায় নিমগ্ন ছিলেন। বন্ধু এবং আত্মীয় স্বজনরা তাঁকে খুব প্রশান্ত এবং অন্তর্দর্শীরূপে স্মরণ করে থাকেন। তিনি বন্ধুদের সাথে খেলাধূলা করা কিংবা সিনেমা থিয়েটারে যাওয়ার ব্যাপারে কখনোই আগ্রহী ছিলেন না।

১৯৫৫ সালে পিতার মৃত্যুর পর পরিবারের জৈষ্ঠ্য সন্তান হিসেবে সংসার প্রতিপালনের দায়িত্ব তাঁর উপর পড়ে এবং বিধবা মাতার অনুরোধে তিনি গৃহস্থ জীবনে প্রবেশ করেন। তাঁর পত্নী শ্রীমতি বাসন্তী দেবীর সাথে বিবাহ অনুষ্ঠানে তাঁর
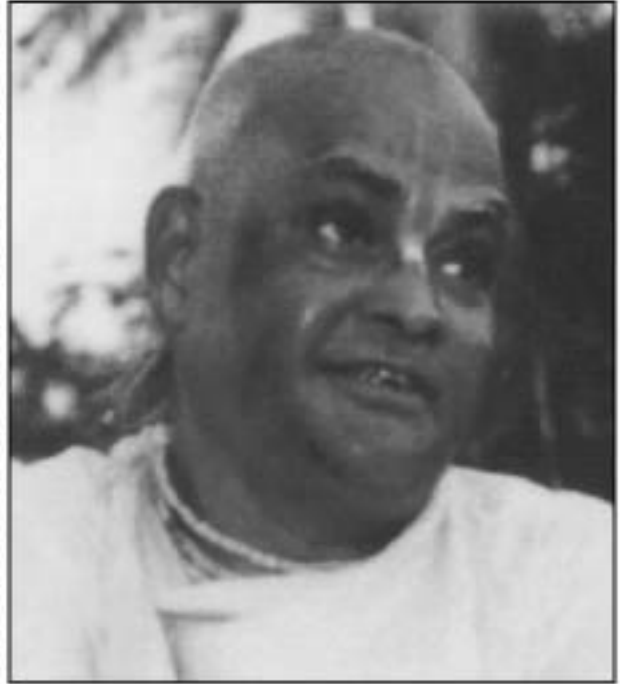
প্রথম সাক্ষাৎ হয়। অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক পাঠ্যক্রম গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু রাত্রিবেলা ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়নের মাধ্যমে পরীক্ষাগুলোতে অংশগ্রহণ করে তিনি উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নম্বর অর্জন করে বি.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে একইভাবে বি,এড্. ডিগ্রী লাভ করেন এবং স্কুল শিক্ষকের পেশায় নিয়োজিত হন। সে যাই হোক, নানাবিধ দায়িত্ব সত্ত্বেও গোপালের প্রতি তাঁর ভালোবাসা একটুও শ্লথ হয়ে যায়নি। প্রতিদিন ৩.৩০ মিনিটে ঘুম থেকে উঠে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ, তুলশীসেবা এবং পরিবারবর্গের কাছে ভগবদ্গীতা পাঠ করে শোনাতেন। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের নিকট কৃষ্ণকথা এবং ভক্তিজীবনের আদর্শ সম্পর্কে কিছু বলার প্রতিটি সুযোগ তিনি গ্রহণ করতেন। তাঁর কিছু ছাত্র ত্রিরিশ বৎসর পর তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন।

স্কুল বন্ধের সময় তিনি তাঁর পত্নীকে নিয়ে হিমালয়ের পাহাড়ে পর্যটনে যেতেন, বিভিন্ন তীর্থস্থান এবং আশ্রমগুলো ভ্রমন করতেন এবং অনেক সময় সেখানকার অনেক মায়াবাদীদের সাথে দর্শন বিষয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হতেন।

১৯৭৪ সালের ৮ এপ্রিল ৪৫ বৎসর বয়সে ব্রজবন্ধু আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা অনুসন্ধানের জন্য তাঁর গৃহ এবং আত্মীয় স্বজনদের ত্যাগ করেন। গৌর-গোপালানন্দ দাস নাম

ধারণ করে শুধুমাত্র একটি ভগবদ্গীতা এবং একটি ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ান এবং গঙ্গার তীরবর্তী অনেক পবিত্র তীর্থস্থান পর্যটন করেন। তিনি একজন পারমার্থিক গুরুর অনুসন্ধান করছিলেন। যিনি মহামন্ত্র সম্পর্কিত তাঁর উপলব্ধিকে আরো উন্নত করতে পারতেন। যদিও তিনি তাঁর গৃহস্থ জীবনে অনেক গুরুর সন্ধান পেয়েছিলেন– উড়িষ্যায় অনেক প্রসিদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় আছে– কিন্তু তিনি এমন কাউকে পাননি যিনি তাঁর হৃদয়কে পরিপূর্ণভাবে স্পর্শ করতে পেরেছিল। এভাবে এক বৎসর ঘুরেও গুরুর সন্ধান না পেয়ে অবশেষে তিনি বৃন্দাবনে পৌছাল– এইরূপ চিন্তা করে যে– তাঁর বাসনা কৃষ্ণের এই প্রিয়ভূমিতে নিশ্চিতরূপে পূর্ণ হবে।

বৃন্দাবনে পৌছার দুই সপ্তাহ পর একটি বিশাল বিজ্ঞাপন চিত্র তাঁর নজরে আসে যাতে লেখা ছিল– "International Society For Krishna Consciousness" Founder-Acarya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada" – সেখানে কিছু বিদেশী ভক্তের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয় যারা তাকে Back to God Head পত্রিকার একটি কপি দেন, কৃষ্ণভক্তির মহিমা বর্ণনাসূচক পত্রিকাটির সূচীপত্র পড়ার সাথে সাথে তাঁর হৃদয় উতলা হয়ে উঠল এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন লাভের জন্য। প্রভুপাদের কক্ষে প্রবেশের সুযোগ লাভ করে প্রভুপাদের কাছে নিজের পরিচয় দিলেন। তাঁর কাছে প্রভুপাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল "তুমি কি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছ?" গৌর-গোপালনন্দ বললেন "না করিনি" " আমি তোমাকে সন্ন্যাস দিব"– প্রভুপাদ মুক্তকণ্ঠে ঘোষনা করলেন। প্রভুপাদ তাঁর হৃদয়কে জানেন উপলব্ধি করে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রভুপাদের পাদপদ্মে সমর্পন করে তাঁর দীক্ষিত শিষ্যে পরিণত হলেন।

১৯৭৫ সালে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বলরাম মন্দির উদ্বোধনের দিন প্রভুপাদ তাঁকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিয়ে এই আদেশ প্রদান করেন যে– তুমি উড়িষ্যায় গিয়ে প্রচার কর এবং ভুবনেশ্বরে আমাদেরকে দান করা নতুন জমিটিতে একটি মন্দির গড়ে তোলো এবং তাঁর নতুন নাম হয় গৌর গোবিন্দ স্বামী।

নতুন দান করা জমিটি ছিল মশা, সাপ, কাঁকড়া বিছায়পূর্ণ একটি গভীর জঙ্গল। এটি ছিল শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে এত দূরে এমনকি দিনের বেলায় পর্যন্ত মানুষ সেখানে যেতে ভয় পেত। শ্রীল প্রভুপাদের মনোভিলাষকে হৃদয়ে ধারণ করে গৌর গোবিন্দ স্বামী দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজ করেছিলেন। অনেক সময় চা ব্যবসায়ীর গুদামে থেকে থেকে এমনকি মাঝে মাঝে রাস্তা নির্মাণকারী শ্রমিকের ছোট কুঁড়েঘরে তার সাথে ভাগাভাগি করে থেকে তিনি উড়িষ্যা ভাষায় গ্রন্থ অনুবাদের কাজ আরম্ভ করেছিলেন– যা তিনি শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন। সামান্য কিছু দান সংগ্রহ করার জন্য তিনি বাড়ি থেকে বাড়ি, অফিস থেকে অফিস এমনকি সমগ্র ভুবনেশ্বরের ভিতর বাহির ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং দান করা সেই জমিটিতে নিজের হাতে তৃনপত্রে ছাওয়া একটি কুঁড়েঘর তৈরী করেছিলেন।

১৯৭৭ সালের প্রথম দিকে শ্রীল প্রভুপাদ ভুবনেশ্বরে এসেছিলেন। যদিও রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায় শ্রীল প্রভুপাদের জন্য আরামদায়কভাবে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ সেই প্রস্তাব নাকচ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন "আমি সেখানে থাকব যেখানে আমার শিষ্য সন্তান গৌর গোবিন্দ আমার জন্য একটি মাটির 'কুঁড়েঘর বানিয়েছে'। শ্রীল প্রভুপাদ ১৭ দিনের মতো ভুবনেশ্বরে ছিলেন এবং সেখানেই তিনি তাঁর শ্রীমদ্ভাগতের দশম স্কন্ধের কাজ আরম্ভ করেছিলেন। শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর শুভ আবির্ভাব তিথির দিন তিনি ভুবনেশ্বরে প্রস্তাবিত মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন, সেটা ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠিত সর্বশেষ প্রকল্প।

একবার ১৯৭৯ সালে মায়াপুর ভ্রমণকালে গৌর গোবিন্দ স্বামী একটি কীর্তন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, সেখানে তিনি অচেতন হয়ে ভূমিতে পতিত হন। ইস্কনের নেতৃস্থানীয় এবং কিছু গণ্যমান্য ভক্ত তাঁকে তাঁর কক্ষে নিয়ে আসেন। কয়েকজন ডাক্তারও এসেছিলেন কিন্তু তারা তাঁর এই অবস্থার কারণ অনুসন্ধানে ব্যর্থ হলেন। এমন কি একজন তো বলেই বসেছিল যে তাঁকে হয়ত ভূঁতে পেয়েছে। অবশেষে শ্রীল প্রভুপাদের একজন গুরুভ্রাতা অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ ব্যাখ্যা করলেন যে, গৌর গোবিন্দ স্বামী ভগবৎ প্রেমের অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ের 'ভাব' এর লক্ষণ প্রকট করেছিলেন।

ভুবনেশ্বরে ফিরে এসে তিনি তাঁর গুরুদেব কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বের উপর আরো গভীরভাবে নিমগ্ন হলেন। পাশ্চাত্যের কিছু ভক্তকে পাঠানো হয়েছিল তাঁকে সাহায্যে করার জন্য কিন্তু তাদের অধিকাংশই সেই কঠিন পরিস্থিতি সহ্য করে উঠতে পারলেন না। তারা এটা দেখে বিস্ময়াভিভূত হতেন যে মহারাজ কিভাবে দিনে একবার খেয়ে কখনোবা না ঘুমিয়ে থাকতেন, কখনো বিরক্ত অনুভব করতেন না। তিনি শুধু দিন রাত প্রচার, জপ আর তাঁর দিনপঞ্জী লিখতেন।

শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ শিরোধার্য করে গৌর গোবিন্দ স্বামী অত্যন্ত তেজোদ্দীপ্তভাবে সমগ্র উড়িষ্যায় ব্যাপক প্রচার চালিয়েছিলেন। শুধুমাত্র পদযাত্রা মহোৎসব আর নামহট্ট অনুষ্ঠান যা তিনি সূচনা করেছিলেন– তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সুপ্রাচীন লীলাভূমির শতশত হাজার হাজার লোককে তাদের আধ্যাত্মিকতার মূল উদ্ঘাটন এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কীর্তনে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছিল।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

শ্রীল প্রভুপাদ গৌর গোবিন্দ স্বামীকে ৩টি আদেশ প্রদান করেছিলেন– তাঁর ইংরেজী গ্রন্থসমূহ উড়িষ্যা ভাষায় অনুবাদ, ভুবনেশ্বরে মন্দির স্থাপন এবং সমগ্র পৃথিবীব্যাপী প্রচার করা। এই আদেশ গুলো হৃদয়ে ধারণ তথা বাস্তবায়ন করাই ছিল গৌর গোবিন্দ স্বামীর জীবন। তাঁর একটি কঠিন নীতি ছিল যে, প্রতিদিনের নির্দিষ্ট অনুবাদের কাজ শেষ না হলে তিনি খেতেন না। এমন কি দীর্ঘ আন্তর্জাতিক পথ ভ্রমণের পরও গৌর গোবিন্দ স্বামী তাঁর গুরুদেব প্রদত্ত অনুবাদের কাজ সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিতেন অতঃপর খাওয়া অথবা ঘুম এই বিষয়টি ভক্তদের হৃদয় স্পর্শ করত। এটা ছিল তাঁর জীবনের এমন একটা অনুশীলন বা অভ্যাস যা তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পালন করে গেছেন।

১৯৮৫ সালে গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজ প্রচার করার জন্য প্রথম বারের মতো পাশ্চাত্যদেশ সমূহ ভ্রমণ করেন। কৃষ্ণকথা বলার ব্যাপার তিনি এতটাই আগ্রহান্বিত ছিলেন যে তাঁর পায়ের মারাত্মক ক্ষত এবং ব্যক্তিগত অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি প্রতিবছর এগার দিনের জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে কৃষ্ণ কথা বলার ব্যবস্থা করতেন।

যদিও ব্যক্তিগত আচরণের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত বিনীত এবং মৃদুস্বভাব সম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের উপর ক্লাশ দেয়ার সময় তিনি সিংহের মতো গর্জন করতেন। তাঁর শ্রোতাদের সমস্ত অহংকার চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে তাদের হৃদয়ের সমস্ত ভ্রান্ত ধারণাকে বিধৌত করে দিতেন। কৃষ্ণকথা ছিল তাঁর জীবন এবং আত্মা। তিনি প্রায় সময়ই বলতেন " যে দিনটি কৃষ্ণ কথা ছাড়া গিয়েছে, সেটি অত্যন্ত বাজে একটি দিন।" পাঠদান কালে অপরিহার্যভাবে সহসাই তিনি সজোরে কীর্তন করে উঠতেন। প্রত্যেককেই ভক্তিময় আনন্দের ভাবে নম্রতায় আর শরণাগতির ভাবে পুষ্ট করে তুলতেন যা কিনা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং অন্যান্য আচার্যদের প্রার্থনায় অভিব্যক্ত হয়েছে।

শাস্ত্রের উপর গৌর গোবিন্দ স্বামীর অগাধ জ্ঞান ছিল, তিনি সবকিছুকে বৈদিক শাস্ত্রের সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সারাতিসার করে তুলতেন। অনেক সময় তিনি যদি কোন শিষ্যকে প্রশ্ন করতেন এবং সে যদি শাস্ত্র প্রমাণের উল্লেখ পূর্বক উত্তর দিতে না পারত তাহলে মহারাজ তৎক্ষণাৎ সজোরে বলে উঠতেন "সে একটি প্রতারক। অসরল হইয়ো না। একজন বৈষ্ণব সব সময় কর্তৃপক্ষের উল্লেখ করে থাকেন।"

এভাবে গৌর গোবিন্দ স্বামী নির্ভীকতার সাথে প্রচার করতেন এবং শাস্ত্রের কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কার্যতঃ অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রে কখনো আপোষ করতেন না। তিনি বলতেন "যে কৃষ্ণকে দেখতে পায়না। সে একটি অন্ধ। সে কৃষ্ণ কথা বলতে পারে। কিন্তু মনের দিক দিয়ে সে কল্পনা করছে। কাজেই তার বাক্য কখনো ফলপ্রদ বা কার্যকর হবে না। একজন প্রকৃত সাধু কখনোই তাত্ত্বিকভাবে কিছু বলেন না তিনি শাস্ত্র প্রমাণের মাধ্যমে বলেন"।

গৌর গোবিন্দ স্বামী একটি দিনপঞ্জী রাখতেন যাতে তিনি প্রতিদিনকার কাজের হিসাব অব্যর্থভাবে লিপিবদ্ধ করতেন। প্রতিদিনের লেখাটি এভাবে শেষ হতো। " যে ধরনের সেবাই এই দাস আজকে করেছে গোপাল তা জানে।" তিনি প্রতিদিন দিনপঞ্জীতে গোপালের নিকট প্রার্থনা করতেন– "দয়া করে আমাকে সম-মানসিকতার ভক্তের সঙ্গ দাও।"

দীর্ঘ ১৬ বছর দৃপ্ত উদ্যমের পর ১৯৯১ সালের রামনবমী তিথিতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শুভ আর্বিভাব তিথির দিন ভুবনেশ্বরে একটি মহাসমারোহপূর্ণ কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজ তাঁর পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের আদেশের বাস্তবায়ন দান করেন। তখন থেকে এই কৃষ্ণ বলরাম মন্দিরটি সতেজে বেড়ে উঠা একটি সুন্দর প্রকল্প হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে যা প্রতিবছর হাজার হাজার পর্যটককে আকর্ষণ করে।

তিনি তাঁর সাধারণ জীবন যাত্রার প্রণালী কখনোই ত্যাগ করেননি। এমনকি জীবনের শেষ দিনগুলোতেও তিনি মাটির তৈরী সেই ছোট্ট ঘরটিতে বাস করতেন যা ১৯৭৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদের জন্য তৈরী কুঁড়েঘরটির পাশে তৈরী করা হয়েছিল। অনেক সময় ভক্তরা তাঁকে অনুরোধ করতেন তাঁর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সমূহ আরো বর্ধিত বা বিস্তৃত করার জন্য। কিন্তু তিনি সমসময়ই তা প্রত্যাখ্যান করতেন আর বলতেন " আমি ব্যবস্থাপক নই, আমি প্রচারক,।" যাই হোক যখন গদাই গিরির সেই জমিটি যেখানে তিনি তাঁর শৈশব কাটিয়েছিলেন এবং যেখানে তাঁর প্রাণপ্রিয় গোপাল একটি সাধারণ মন্দিরে থাকত, সেই জমিটি ইস্‌কন-কে দান করা হয়। তখন সেখানে তিনি তাঁর প্রিয় গোপালের জন্য একটি আড়ম্বর পূর্ণ মন্দির গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

শ্রীল গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজ বলেছিলেন আমি ভুবনেশ্বরে একটি কান্নার স্কুল খুলেছি। যদি আমরা ক্রন্দন না করি তবে কখনো কৃষ্ণকে পাব না। এটাই ছিল সেই বার্তা যা তিনি তাঁর লীলা প্রকট কালীন সময়ের শেষ দশটি বছর অত্যন্ত তেজেন্দীপ্তভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচার করেছিলেন।

১৯৯৬ সালে তাঁর জীবনের সর্বশেষ জানুয়ারী মাসে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে– "শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতি ঠাকুর বলেছেন যে– এই জড় জগৎটা কোন ভদ্র লোকের জন্য উপযুক্ত জায়গা নয়। অতএব যেহেতু তিনি বিতৃষ্ণ ছিলেন, তাই অকালেই তিনি এই পৃথিবী ত্যাগ করেছিলেন। আমিও ত্যাগ করতে পারি। আমি জানি না। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি গোপাল! গোপাল যাই চান আমি তাই করব।" পরের দিন শ্রীল গৌর গোবিন্দ স্বামী তাঁর গোপালকে দেখার জন্য গদাই গিরি গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পর পরবর্তী চারদিন তিনি হাজার সংখ্যক লোকের

কাছে আরো অধিক শক্তিশালীভাবে প্রচার করেছিলেন যারা ভুবনেশ্বরে প্রভুপাদ জন্মশত বার্ষিকীতে যোগদান করতে এসেছিলেন। তারপর তিনি ইস্কনের বার্ষিক ব্যবস্থাপনা সভায় যোগ দেয়ার জন্য মায়াপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন।

১৯৯৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী দিনটি ছিল শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতি ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি। ইস্কনের দুই জন সিনিয়র ভক্তের অনুরোধে শ্রীল গৌর গোবিন্দ স্বামী তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য একটি সন্ধ্যে সভার আয়োজন করেন। তাঁরা পূর্বে কখনো মহারাজের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেননি। কিন্তু মহারাজের কিছু গ্রন্থ অধ্যয়ন করার পর তাঁর কাছ থেকে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করার জন্য তাঁরা খুবই আগ্রহী হয়েছিলেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন-"মহাপ্রভু কেন জগন্নাথপুরীতে অবস্থান করেছিলেন।" প্রশ্ন শুনে আনন্দিত হয়ে তিনি পুরীতে মহাপ্রভুর লীলার গোপন তাৎপর্য সম্পর্কে বলতে শুরু করেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে থেকে চলে গিয়েছিলেন সেই সময়ে শ্রীমতি রাধারাণী এবং শ্রীকৃষ্ণের বিরহ ব্যাথার কথা তিনি হৃদয় দিয়ে বর্ণনা করতে লাগলেন। এই মর্মস্পর্শী লীলার কথা "The Embankment of Separation" গ্রন্থে অষ্টম অধ্যায়ে রয়েছে। এভাবে তাঁর কক্ষের সমস্ত বৈষ্ণবদের কৃষ্ণ কথার মধুরিমা দিয়ে বিমুগ্ধ করে ধীরে ধীরে তিনি লীলার সেই বিষয়টি প্রকাশ করলেন যেখানে শ্রীমতি রাধারাণী এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মিলিত হয়েছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছিলেন কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতি রাধারাণীকে দেখে এতটাই আনন্দিত আর উৎফুল্ল হয়েছিলেন যে তিনি বড় বড় চোখ আর সংকুচিত বাহু সমন্বিত তাঁর সেই প্রভু জগন্নাথের রূপ প্রকাশ করেছিলেন। এমন সময় ভক্তরা লক্ষ্য করছিলেন যে তাঁর চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠছে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে আসছে। কষ্টে সৃষ্টে তিনি বললেন "এরপর শ্রীকৃষ্ণের নয়ন রাধারাণীর নয়নের উপর পড়ল, নয়নে নয়নে মিলন হলো।" তিনি আর বলতে সমর্থ না হয়ে হাত জোর করে বললেন "দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন আমি আর কথা বলতে পারছিনা।" তখন তিনি তাঁর সর্বশেষ নির্দেশ দিলেন-"কীর্তন! কীর্তন!" উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তখন কীর্তন আরম্ভ করলেন কারন তাঁদের গুরুদেব তখন শান্তভাবে তাঁর বিছানায় শুয়ে পড়েছেন। ধীরে ধীরে এবং গভীরভাবে শ্বাস নিতে লাগলেন। একজন সেবক গোপাল জিউয়ের একটি চিত্রপট তাঁর হস্তে দিলেন। তখন গোপালের দিকে প্রীতিভরে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে শ্রীল গৌর গোবিন্দ স্বামী বলে উঠলেন- "গোপাল!" এবং চিন্ময় আকাশে তাঁর প্রিয় প্রভুর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য তিনি প্রস্থান করলেন।

প্রতিদিন ভাগবত ক্লাশের পূর্বে মহারাজ উড়িষ্যার ভাষায় একটি গান গাইতেন, যা তিনি তাঁর ছোট বেলায় শিখেছিলেন। এখন তাঁর সেই প্রার্থনাটাই পূর্ণ হয়েছিল-

পরমানন্দ হে মাধব
পদকজুচি মকরন্দ
সে মকরন্দ পানকরি
আনন্দে বোলো 'হরি হরি'
হরিকাঁ নামে বান্দো বেলা
পারি করিবে চোকা-ডোলা
সে চোকা-ডোলাঁকা পাইয়ারে
মনো-মো রহু নিরন্তরে
মনো-মো নিরন্তরে রহু
'হা-কৃষ্ণ' বোলি জীবো-যাও
হা-কৃষ্ণ বোলি যাও জীবো
মোটে উদ্ধারো রাধা-ধবো
মোটে উদ্ধারো রাধা-ধবো
মোটে উদ্ধারো রাধা-ধবো

" ও পরমানন্দময় মাধব! তোমার চরণ কমল থেকে অমৃত প্রবাহিত হচ্ছে। সেই অমৃত পান করে আমি আনন্দে গান করি 'হরি হরি' শ্রী হরির নাম করে আমি একটি ভেলা বেধেঁছি, যার উপরে করে প্রভু জগন্নাথ আমাকে এই জড় জগৎরূপ সমুদ্র পার করে নিয়ে যাবেন। আমার হৃদয় সর্বদাই বৃহৎ নয়ন সমন্বিত সেই প্রভু জগন্নাথের চরণ কমলে নিবদ্ধ থাকুক। এই উপায়ে আমি বলে উঠব 'হায়! কৃষ্ণ' এবং আমি আমার জীবন ত্যাগ করব। ও! শ্রীমতি রাধারাণীর পতি দয়া করে আমাকে উদ্ধার কর।

যত নগরাদী গ্রামে

দেশব্যাপি ইস্‌কনের রথযাত্রা উৎসব উদযাপন

(সিলেট) সমগ্র বিশ্বের ন্যায় আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) সিলেটও শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব-২০০৮ উপলক্ষ্যে গত ৪ জুলাই হতে ১২ জুলাই ২০০৮ ইং পর্যন্ত নয়দিন ব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে।

উক্ত অনুষ্ঠানে আলোচনা সভায় ইস্‌কন সিলেট মন্দিরের এর অধ্যক্ষ শ্রী নবদ্বীপ দ্বিজ গৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট এর অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জে. এন বিশ্বাস। বিশেষ অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- ড. আর. কে. ধর, শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী জুয়েল ও শ্রী সুপর্ণ দে। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইস্‌কন সিলেট মন্দির পরিচালনা পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক- শ্রী বলদেব কৃপা দাস ব্রহ্মচারী।

(কিশোরগঞ্জ) এই প্রথম বারের মত শ্রীশ্রী হরেকৃষ্ণ নামহট্ট সংঘ, কিশোরগঞ্জের উদ্যোগে এবং কেন্দ্রীয় নামহট্ট সংঘ, স্বামীবাগ ঢাকা এর সার্বিক নির্দেশনায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা মহোৎসব ২০০৮ ইং উদ্‌যাপিত হলো।

৯দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্যে বর্ণাঢ্য শোভা যাত্রা, লীলামৃত পাঠ, ভজন কীর্তন, যন্ত্রসংগীত, পদাবলী কীর্তন ও ধর্মীয় আলোচনা সভা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ। উল্টো রথযাত্রা উদ্বোধন করেন- স্থানীয় জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শ্রী বনমালী ভৌমিক।

(বগুড়া) আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) বগুড়া শাখা শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব- ২০০৮ উপলক্ষ্যে গত ৪ জুলাই হতে ১১ জুলাই ২০০৮ ইং পর্যন্ত আট দিন ব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- বগুড়া জেলা প্রশাসক জনাব হুমায়ন কবির। অন্যান্য মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন- আনন্দ আশ্রমের সভাপতি দিলিপ কুমার দেব, পুলিশ সুপার আকরাম হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আইয়ুব হোসেন, বগুড়া পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি অমৃতলাল সাহা ও অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইস্‌কন বগুড়া মন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রী খরাজিতা কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভজন কীর্তন, যন্ত্রসংগীত, পদাবলী কীর্তন ও ধর্মীয় আলোচনা সভা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

(তাঁরাগঞ্জ) শ্রীশ্রী রাধা মোহন জিউ, তাঁরাগঞ্জ, ইস্‌কন মন্দির এর উদ্দ্যোগে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা মহোৎসব- ২০০৮ই বিপুল সমারহে পালিত হয়। অনুষ্ঠান মালায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভজন কীর্তন, যন্ত্রসংগীত, পদাবলী কীর্তন ও ধর্মীয় আলোচনা সভা। পরিশেষে ভক্তদের মাঝে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

(হবিগঞ্জ) শ্রী শ্রী নরসিংহ জিউ মন্দির, ইস্‌কন-এর উদ্যোগে ৯দিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান মালার মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব- ২০০৮ ইং উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল- মঙ্গলআরতি, গুরুপূজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা গৌর সুন্দরের আরতি, ভোগ আরতি, ভজন কীর্তন, পদাবলী কীর্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

(নরসিংদী) ইস্‌কনের আয়োজনে নরসিংদী শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের উদ্যোগে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব- ২০০৮ ইং উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল- শোভাযাত্রা, মঙ্গলআরতি, গুরুপূজা, গৌর সুন্দরের আরতি, ভোগ আরতি, ভজন কীর্তন, পদাবলী কীর্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- বাংলাদেশের বিভিন্ন ইস্‌কন মন্দির হতে আগত ভক্তবৃন্দ, নরসিংদীর সর্ব্ব স্তরের গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ তন্মেধ্য ছিলেন নরসিংদী পৌর সভার কাউন্সিলর শ্রী অনিল চন্দ্র ঘোষ, মোঃ সামছুদ্দিন আহাম্মদ, মোঃ হারুন অর রশিদ হারুন প্রমুখ।

(নোয়াখালী) শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ গৌর নিত্যানন্দ মন্দির (ইস্‌কন) চৌমুহনী, নোয়াখালীর উদ্যোগে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসব -২০০৮ ইং নয়দিন ব্যাপি পালিত হয়। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল- অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, শোভাযাত্রা, মঙ্গলআরতি, গুরুপূজা, ইস্‌কন যুব গোষ্ঠী সম্মেলন, ছোটদের চিত্রাংকেন প্রতিযোগিতা, ভজন কীর্তন, পদাবলী কীর্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন- জেলা প্রশাসক জনাব আবুদল হক ও চৌমুহনীর পৌর মেয়র জনাব আবদুর রহিম সাহেব, সর্বেশ্বর গোবিন্দ দাস (অধ্যাপক ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) ও পতিত উদ্ধারণ দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ।

(খুলনা) খুলনা মহানগর পূজা উদযাপন পরিষদের উদ্যোগে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা মহোৎসব- ২০০৮ইং পালিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে জগন্নাথ বলদেব ও সুভদ্রা মহারাণীর সেবা দায়িত্ব পালন করেন- আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ ইস্‌কন।

১৫ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান মালার মধ্যে ছিল- আলোচনা সভা, মঙ্গলআরতি, গুরুপূজা, গৌর সুন্দরের আরতি, ভোগ আরতি, ভজন কীর্তন, পদাবলী কীর্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

(চাঁদপুর) আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) অনুমোদিত শ্রীশ্রী হরেকৃষ্ণ নামহট্ট মন্দির, হরিসভা-পুরান বাজার-চাঁদপুর- এর উদ্যোগে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব- ২০০৮ পালিত হয়। রথ উদ্বোধন করবেন- জনাব নাছির উদ্দিন আহম্মদ, (মেয়র চাঁদপুর পৌরসভা), সভাপতিত্ব করেন- শ্রী সুভাষ চন্দ্র রায়, (সভাপতি, ইসকন নামহট্ট মন্দির, চাঁদপুর)।

(বরিশাল) আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনমৃত সংঘ (ইস্‌কন) বরিশাল শাখার উদ্যোগে শ্রীশ্রী রাধাশ্যাম সুন্দর মন্দিরে আড়ম্বরের সাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠান মালার মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব- ২০০৮ মহোৎসব পালিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে রথযাত্রার উদ্বোধন করেন- মাননীয় বিচারপতি গৌরগোপাল সাহা, প্রধান অতিথি ছিলেন- রবিশাল সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আওলাদ হোসেন (দিলু)

অনুষ্ঠান মালার মধ্যে ছিল- যজ্ঞ অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা, মঙ্গলআরতি, গুরুপূজা, গৌর সুন্দরের আরতি, ভোগ আরতি, ভজন কীর্তন, পদাবলী কীর্তন ইত্যাদি। পরিশেষে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

(কুমিল্লা) আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনমৃত সংঘ (ইস্‌কন) কুমিল্লা শাখার উদ্যোগে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব- ২০০৮ উপলক্ষ্যে ৮দিন ব্যাপী মহোৎসব পালিত হয়। উল্টোরথযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন- ইস্‌কনের অন্যতম আচার্য ও জি বি সি শ্রীল জয় পতাকা স্বামী মহারাজ।

বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে—
ধর্মের নাম হিসেবে 'সনাতন হিন্দু ধর্ম' কথাটিও কি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

– শ্রী অশ্বিনী কুমার সরকার (পৌরহিত্য, স্মৃতিতীর্থ)

যে সমাজে ধর্মের নাম ও সংজ্ঞা প্রশ্নেই বিভ্রান্তি- রয়েছে, সে সমাজে অন্য সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে, তা আমার কাছে বোধগম্য নয়। "সমাজ দর্পণ" ভাদ্র-১৪১৪ সংখ্যায় সম্পাদক সমীপে লেখা এক ক্ষুদ্র পত্রে পুরাণ ঢাকার বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব **শ্রী দয়াময় মল্লিক মহাশয়** বলেছেন, "সনাতন হিন্দু ধর্ম; কিন্তু 'সনাতন মুসলমান ধর্ম' হতে পারে না।" 'সনাতন মুসলমান ধর্ম' হতে পারে না – এ কথা স্বীকার করছি; কিন্তু আমাদের কাছে 'সনাতন হিন্দু ধর্ম' কথাটিও কি সমর্থনযোগ্য হতে পারে? ধর্মের নামের সাথে 'হিন্দু' শব্দ যোগ করার কি কোন প্রয়োজন আছে? সর্বত্র আমাদের তো শাস্ত্রসমর্থিত নামটিই গ্রহণ ও প্রচার করা উচিত। কিন্তু বৃহত্তর হিন্দু সমাজে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, আজ থেকে ২০/২৫ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতভিত্তিক 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ' ও নেপালভিত্তিক 'ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফেডারেশন' – সম্ভবত হিন্দু সমাজ থেকে ব্যাপক হারে ধর্মান্তর রোধের জন্য। ওই সংস্থাদ্বয়ের নেতারা হিন্দু অনুসৃত ধর্মকে 'হিন্দুধর্ম' নামে প্রচার করতেই প্রথমে বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু তাঁরা তাদের অবস্থানের পক্ষে যথেষ্ট জনসমর্থন না পাওয়ায় ধর্মের শাস্ত্রসমর্থিত প্রাচীন নামের সাথে হিন্দু শব্দ যোগ করার পক্ষে অবস্থান নেয়। এঁরাই হিন্দু অনুসৃত ধর্মকে এখন 'সনাতন হিন্দু ধর্ম' নামে নানাভাবে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। ভারতে প্রকাশিত গ্রন্থের মাধ্যমে এর প্রভাব বাংলাদেশেও পড়েছে। আমার মতে, ধর্ম আর জাতি গুলিয়ে ফেলার পরিণাম কখনো সুখকর হয় না। ধর্ম আর জাতির সংজ্ঞা সম্পূর্ণই ভিন্ন কিংবা আলাদা। যারা জাতি আর ধর্মের সংজ্ঞা গুলিয়ে ফেলতে চান, তাঁরা আসলে ধর্মের উদার, সর্বজনীন তথা আন্তর্জাতিক চরিত্র (বুঝে অথবা না বুঝে) ক্ষুন্ন করতে চাচ্ছেন।

কেউ কেউ বলছেন, "বিশ্বের সব মানুষই সনাতন ধর্মে জন্মগ্রহণ করে। তাই খ্রিস্টান, ইহুদি, মুসলমান – এদের ধর্মও সনাতন।" আমি এ ধরনের বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করছি। তারা কেন একতরফাভাবে এ ধরনের কথা বলছেন? তারা তো তাদের বক্তব্যের পক্ষে কোন শাস্ত্রসম্মত যুক্তি কিংবা ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে পারছেন না। কেউ কেউ আবার বিনাবিচারে তাদের বক্তব্যকে সমর্থন করে যাচ্ছেন। আমার মতে মনুষ্য প্রবর্তিত কোন ধর্মই 'সনাতন' নয়। খ্রিস্টান ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছে যীশুখ্রিস্টের জন্মের পর; অর্থাৎ মাত্র ২০০০ বছর আগে; আর ইহুদি ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছে তা-ও প্রায় ৩০০০ বছর আগে। এমতাবস্থায় কেউ যদি ধর্মের শ্রেণীবিন্যাস করতে চান, তবে প্রথমেই তাকে স্বীকার করে নিতে হবে যে, জগতে দুই প্রকার ধর্মের অস্তিত্ব রয়েছে। যেমন – (১) সনাতন ও (২) অসনাতন। 'সনাতন' শব্দের অর্থ – যা পূর্বে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও বহমান থাকবে। হিন্দু অনুসৃত ধর্ম অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে; কিন্তু ভবিষ্যতে টিকে থাকবে তার কী প্রমাণ আছে – এ প্রশ্ন অনেকে করতে পারেন। তবে এর প্রমাণ গীতায়ই রয়েছে। সনাতন ধর্ম "সংস্কার" তথা "সংস্থাপনমূলক"। গীতায় এ কথা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ রয়েছে। (পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্, ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" – গীতা ৪/৮) এখানে সংস্থাপন তথা সংস্কার বলতে জঞ্জালমুক্তকরণ, নিষ্কলুষকরণ, গ্লানিমুক্তকরণ, বিশুদ্ধকরণ, সচলকরণ ইত্যাদি বুঝতে হবে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে যার গ্লানি মুক্ত করেন কিংবা যা সচল রাখেন, তার তো বিনাশ হতে পারে না। তাই হিন্দুর ধর্ম শাশ্বত, চিরন্তন তথা সনাতন। গীতায় এ সনাতন ধর্মকে অতি 'পুরাতন যোগ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'যোগ' মানে পরমেশ্বর ভগবানের সাথে যুক্ত হওয়ার উপায় বা কৌশল। তাই 'যোগ' এখানে ধর্ম অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। মানুষের সৃষ্টি পরমেশ্বর থেকে এবং সেজন্য সে পরমেশ্বরের সাথেই যুক্ত হতে চায়। সুতরাং যে উপায় অবলম্বনে কিংবা যা অনুসরণ বা পালন করলে পরমেশ্বরের সাথে পুনরায় যুক্ত হওয়া যায়, তা-ই মানবের জন্য ধর্ম।

সনাতন ধর্মের প্রবর্তক 'সনাতন পুরুষ' স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই প্রয়োজনে স্বয়ং সৃষ্টিতে অবতীর্ণ হয়ে এ ধর্মের গ্লানি মুক্ত করেন, তা সচল তথা বহমান রাখেন। তাই এ ধর্মের কোন বিনাশ নেই। ঐতিহাসিকগণও বলেন, হিন্দু অনুসৃত ধর্মের উৎস তথা উৎপত্তিকাল নির্ণয় করা যায় না। এর উৎপত্তিকাল অতীতের গর্ভে সম্পূর্ণ লীন। তার মানে প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই এ ধর্ম জগতে বিদ্যমান। এজন্য তা সর্বপ্রাচীন তথা সনাতন। এ নামের পরিবর্তন কিংবা পরিবর্ধনের কোন প্রয়োজন নেই। মনুসংহিতায় 'সনাতন' শব্দের উল্লেখ আছে; রামায়ণ, মহাভারতে তা উলেখ আছে একাধিকবার। কিন্তু উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে হিন্দু শব্দের কোন উলেখ নেই। হিন্দু শব্দ সম্পূর্ণই সম্প্রদায় তথা জাতিবাচক। তাই শব্দটির সম্পর্ক স্থান তথা ভৌগলিক অবস্থানের সাথে – ধর্মের সাথে নয়। এজন্যই ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি ও প্রখ্যাত দার্শনিক ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন, "The term 'Hindu' had originally a territorial and not a creedal signifience. It implied residence in a well-defined geogrphical area." 'হিন্দু' শব্দ কোন ধর্মপ্রবর্তকের নামের সাথে সম্পৃক্ত কিংবা সম্পর্কিত নয়। এর

সম্পর্ক যে স্থান তথা ভৌগলিক অবস্থানের সাথে – তা ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের উল্লিখিত উক্তিতে স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। হিন্দু শব্দের মূলে রয়েছে 'সিন্ধু' শব্দের অনুষঙ্গ। সিন্ধু প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশের উপর দিয়ে বহমান এক বিশাল নদের নাম। এ নদের উভয় তীরে বসবাসকারী অধিবাসীরা অতীতে মানুষ নামেই পরিচিত ছিলেন। আর মানুষ হিসেবে পালনের জন্য বা অনুসরণের জন্য সেকালে তাঁদের একটি ধর্মও ছিল। তবে সে ধর্ম যে হিন্দুধর্ম নামে অভিহিত ছিল না তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। থাকলে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদোপনিষদ কিংবা পবিত্র গ্রন্থ গীতায় অবশ্যই তার উল্লেখ থাকতো। হিন্দু শব্দটি আসলে ধর্মনিরপেক্ষ। কেউ দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করলেও হিন্দু; আবার তা না করলেও হিন্দু। কেউ পরমেশ্বর ভগবানকে সাকার ভাবলেও হিন্দু; আবার নিরাকার ঈশ্বর বিশ্বাসীরাও হিন্দু। এমন কি যারা নিরীশ্বরবাদী তথা ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন, তারাও ভারতে হিন্দু হিসেবে গণ্য হন।

ভারতে শিখ, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, জৈনরাও সাংবিধানিকভাবে হিন্দু হিসেবে গণ্য। দার্শনিক ও কবি আলামা ইকবালও নিজেকে হিন্দু বলে দাবি করতেন। ভারতে মুসলিম আলেমদের একটি বিশিষ্ট ধর্মীয় সংগঠনের নামের সাথেও 'হিন্দ' শব্দ যুক্ত রয়েছে (জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ)। তবে উল্লিখিত সম্প্রদায়ের লোকদের আলাদা আলাদা ধর্ম রয়েছে। ধর্মের নাম 'হিন্দু' করা হলে কিংবা 'হিন্দু' শব্দ ধর্মের সাথে জড়ালে ওইসব সম্প্রদায়ের জনগণ কি তা সহজে মেনে নেবেন? মেনে নিলে তাদের ধর্মীয় স্বকীয়তা রক্ষা পাবে? আমার জানা মতে, স্বকীয়তা বিনষ্ট হয় এমন সিদ্ধান্ত কোন ধর্মীয় গোষ্ঠী কিংবা আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানুষ কখনোই স্বেচ্ছায় মেনে নেয় না। এ প্রসঙ্গে ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং'এর একটি বক্তব্য এখানে তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক হবে বলে আমি মনে করি। ১৯৮৬ সালে নয়াদিল্লীতে এক জনসভায় তিনি বলেছিলেন, "শিখদের 'হিন্দু' বলে অভিহিত করলে তাদের রাগ করা উচিত নয়। ভারতে উদ্ভূত ধর্ম হিসেবে জৈন, বৌদ্ধ ও শিখরাও হিন্দু হিসেবে গণ্য।" (তথ্যসূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭/০৭/১৯৮৬) জৈল সিং'এর এ বক্তব্যের প্রতিবাদ তখন কেবল ভারতে নয়; বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড থেকেও হয়েছিল। বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, চট্টগ্রামের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানান- বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির সভাপতি হেমেন্দ্র লাল বড়ুয়া। এ প্রতিবাদ 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'দি নিউ নেশন' পত্রিকায় ৩০/০৭/৮৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। এমতাবস্থায় ধর্মীয় সংস্থার নেতারা ধর্মের নামের সাথে কেন এবং কী উদ্দেশ্যে হিন্দু শব্দ যোগ করতে চাচ্ছেন, তা আমার কাছে বোধগম্য হচ্ছে না। যারা এ কাজটি করছেন, তাঁরা কি হেমেন্দ্র লাল বড়ুয়ার এ প্রতিবাদ লক্ষ্য করেননি? লক্ষ্য করলে তখন কেন তাঁরা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি? হিন্দু শব্দ ধর্মের সাথে যোগ করে সাময়িকভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করা সম্ভব হলেও হতে পারে; কিন্তু এ কাজের মাধ্যমে তো হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরীণ ভেদ-বৈষম্য দূরীকরণ কিংবা ধর্মান্তর রোধ করা সম্ভব নয়। বৈষম্যের কারণে কিছুদিন আগেও ভারতে ৫০ হাজার হিন্দু একযোগে ধর্মান্তরিত হয়ে ভিন্ন সমাজে চলে গেছে। অথচ তা স্বীকার করা হচ্ছে না। এর চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার আর কী হতে পারে? আমার মতে, হিন্দু সমাজের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে ধর্মতত্ত্বের অপব্যাখ্যাকারীরা। ভারত-বাংলাদেশের কোন কোন স্থানে গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষায় ধর্মের নামে, সমাজ সংস্কারের নামে এখনো এ অপব্যাখ্যার প্রচার চলছে। এমতাবস্থায় ইস্কন কেবল ধর্মের তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে ওইসব অপপ্রচারের বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ রাখতেও যথাসাধ্য ভূমিকা পালন করছে এবং কোন কোন বক্তব্যের বিরুদ্ধে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে। ইস্কনের প্রচার সাদামাটা কিংবা গতানুগতিক নয়; এর প্রচার যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানভিত্তিক। ইস্কন যেমন সমাজের অভ্যন্তরে সাম্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠায় অটল থাকছে; তেমনি আবার মেধা ও যোগ্যতার বিচারটাও ইস্কনে যথাযথভাবে হচ্ছে। বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষজনেরা এ কারণেই ইস্কনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করছে। বস্তুত বৈদিক সংস্কৃতির বিস্তার এখন একমাত্র ইস্কনের মাধ্যমেই ঘটে চলেছে।

উগ্র হিন্দুত্ববাদী অবস্থান থেকে সরে এসেছে ভারতের বিজেপি (দ্রষ্টব্যঃ সংবাদ ৮/১১/২০০২, প্রথম আলো ২৪/০৬/২০০৪)। এর নেতারাই এখন বলছেন, "হিন্দুতে কোন উপাসনা পদ্ধতি নেই। আবহমানকাল থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির যে অবিচ্ছিন্ন ধারা সৃষ্টি হয়েছে এবং তাতে যে নতুন ধারা এসে মিশেছে তার সবগুলো নিয়েই ভারতের হিন্দুত্ব। আমরা মনে করি, সারা ভারতে যে বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতিগুলো চালু আছে সে সমস্ত উপাসনা পদ্ধতিগুলো আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ হয়ে থাকবে। হিন্দুত্ব হচ্ছে ভারতের জীবন পদ্ধতি। আমাদের সুপ্রিম কোর্টও এক রায়ে বলেছে, 'হিন্দুত্ব কিছুতেই কমিউন্যাল নয়'। আমরা হিন্দুত্বকে ধর্ম বলে মানি না। সনাতন ধর্ম আছে; কিন্তু হিন্দু বলে কোন ধর্ম নেই। আমরা সাধারণ মানুষকে এখন একথা বোঝানোর চেষ্টা করছি।" (তথ্যসূত্রঃ আজকের কাগজ ২৬/০৪/১৯৯৬) বিজেপি'র নেতারাই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে যেখানে বলছেন, 'হিন্দু' বলে কোন ধর্ম নেই, সেখানে 'হিন্দু' শব্দকে ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত করতে কারা ইন্ধন যোগাচ্ছেন? কেন যোগাচ্ছেন? এর ব্যাখ্যা আমাদের জানা প্রয়োজন। তবে ভারতে হিন্দু শব্দের অর্থ যাই হোক না কেন, বাংলাদেশে হিন্দু একটি শান্তি প্রিয় সম্প্রদায়। তাই বলে এখানে এ সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মের নাম হিন্দু
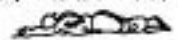
নয়। হিন্দুর ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম। চীনা, জাপানি, আমেরিকান কিংবা কোরিয়ানরাও সনাতন ধর্মের অনুসারী হতে পারেন, যদি তারা তা গ্রহণ করেন এবং মেনে চলেন। ইস্‌কন ধর্মের রুদ্ধ দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এখন পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের যে কোন সম্প্রদায়ের মানুষই সনাতন ধর্মের অনুসারী হতে পারছেন। 'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচারিত হবে হরেকৃষ্ণ নাম।' একথা বলেছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং। প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত 'ইস্‌কন' মহাপ্রভুর এ বাণীর সার্থক বাস্তবায়ন ঘটাতে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। কট্টর কমিউনিস্ট দেশগুলোও ইস্‌কনের এ প্রচারকার্যক্রমের বাইরে নেই। রাশিয়ায় কৃষ্ণভক্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। সেখানেও গড়ে উঠছে বিশাল কৃষ্ণমন্দির 'গ্লোরি অব ইন্ডিয়া'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট শিল্পপতি ও মোটরগাড়ী নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের মালিক হেনরি ফোর্ডের প্রপৌত্র আলফ্রেড ফোর্ড (শ্রী অম্বরীশ দাস) এ মন্দির তৈরির বেশিরভাগ অর্থের যোগান দিচ্ছেন। ধর্মের সঠিক সংজ্ঞা ও যুগোপযোগী ব্যাখ্যার কারণেই এ অসাধ্যকার্য সাধিত হচ্ছে।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বিশ্বের সকল মানুষই একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং ওই জাতির নাম মানবজাতি। কিন্তু বর্তমানে 'নেশন' বলতে যে জাতি বুঝায়, তা রাষ্ট্রভিত্তিক ও মানবজাতির একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। বাংলাদেশে আমাদের নেশন্যালিটি বাংলাদেশী; যার মধ্যে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ব্রাহ্ম ইত্যাদি সব সম্প্রদায়ের মানুষই রয়েছেন। তবে এসব সম্প্রদায়ের মানুষের আলাদা আলাদা ধর্ম রয়েছে। সুতরাং সব মানুষের ধর্মই 'সনাতন' – এ ধরনের বক্তব্য কেবল বিভ্রান্তিকর নয়; সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অবান্তর। মানুষ মাত্রই ভুল করতে পারে এবং তা করেও। তবে কেউ ভুল করলে তা স্বীকার করা উচিত। তা স্বীকার না করে সেই ভুলের পক্ষেই যদি বারবার কুযুক্তি দাঁড় করানো হতে থাকে, তবে সমাজের জন্য তা মোটেই সুখকর হতে পারে না। উল্লেখ্য, প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব মত থাকতে পারে এবং তা আছেও। তাই বলে সব 'মত'ই ধর্ম হিসেবে গণ্য নয়। একমাত্র মহাপুরুষদের মতই ধর্ম হিসেবে গণ্য হয়। তাই 'মত ধর্ম নয়' – এ কথাও পুরোপুরি সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। বলা হচ্ছে, আগুনের ধর্ম উত্তাপ কিংবা আলো প্রদান করা। জলের ধর্ম শৈত্য কিংবা তারল্য। কিন্তু মানুষের ধর্ম কী? কেউ কেউ বলেন মানুষের ধর্ম হচ্ছে মনুষ্যত্ব। তবে এ গুণটিও কি মানুষ জন্মসূত্রে প্রাপ্ত হয়? শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে, ধর্ম হচ্ছে সনাতন পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশ-নির্দেশ তথা আইন। 'ধর্মং তু সাক্ষাদ্‌ ভগবদ্‌ প্রণীতম্‌।' যারা ভগবানের প্রণীত আইন বা আদেশ-নির্দেশ যথাযথভাবে মেনে চলেছেন, বিশ্বে তথা ভগবানের রাজ্যে কেবল তাঁরাই সনাতন ধর্মের অনুসারী; অন্যেরা নন। এটাই সঠিক ও যুগোপযোগী ব্যাখ্যা। এ ক্ষেত্রে ভিন্ন ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই।

ধর্মের নাম বিষয়ে আমার এরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার কোন প্রয়োজন হতো না যদি 'হিন্দু' শব্দকে ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত করার কোন উদ্যোগ বা প্রয়াস ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের মধ্যে বার বার লক্ষ্য করা না যেতো। এরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার জন্য কেউ কেউ আমার প্রতি মনক্ষুন্ন হতে পারেন। তবে আমার বিশ্বাস ধর্মে সমালোচনা কিংবা বিতর্ক প্রশ্রয় না পেলে তা একসময় ব্রাহ্মণ্যবাদ, মৌলবাদ কিংবা অন্য কোন অসহিষ্ণু মতবাদে পর্যবসিত হতে পারে। আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমেই প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়; সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কেবল বিজ্ঞান ও রাজনীতির ক্ষেত্রে নয় – কথাটি ধর্ম ও সমাজনীতির ক্ষেত্রেও সত্য বলে গ্রহণ করা সমীচীন। উল্লেখ্য, আমার এ বক্তব্যের উপর কেউ যদি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে চান, তবে করতে পারেন। আমার সব বক্তব্য সমালোচনার উর্ধ্বে – তা আমি মনে করি না। সমাজের সর্বত্র শান্তি, শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হোক, বিশ্বের সকল মানুষ সুখী হোক। এটাই আমার একান্ত কামনা। ***********

আমি কিভাবে কৃষ্ণ ভক্ত হলাম

– সর্বভাবনা দাস

আর্মেনিয়ার মেগ্রি শহরে ১৯৭০ সালের ২৬ অগাস্ট আমার জন্ম হয়েছিল। পূর্বাশ্রমে আমার নাম ছিল গাগিল্‌স্ বগুনিয়াৎযান। বাবার নাম সেরোজা বগুনিয়াৎযান এবং মায়ের নাম মার্গো কাগ্রামন্‌য়ান।

আমার জন্মের বহু আগে থেকেই আর্মেনিয়াতে কমিউনিস্ট শাসন চলছিল। ধর্ম সম্বন্ধে কোনও কথা বলা ছিল আইনত নিষিদ্ধ। বহু ধর্মপ্রচারককে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়েছিল। রাশিয়ায় শ্রীল প্রভুপাদের পদার্পণের পর থেকেই সেখানে ইস্‌কনের অঙ্কুরোদগম হয়েছিল। কেজিবি দল জানতে পেরেছিল যে, ইস্‌কন ইতিমধ্যেই সমস্ত বিশ্বে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। রাশিয়াতে যেন তা না ঘটে, সেই জন্য আতঙ্কিত কেজিবি দলের চেষ্টার কোনও অন্ত ছিল না।

একদিন আমার পরিচিত একটি মেয়ে আমাকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সম্বন্ধে জানায়। সে বলেছিল, এই মন্ত্র জপ করলে দিব্য শক্তির অধিকারী হওয়া যায়। আমি সরল মনে তা মেনে নিয়েছিলাম। সুযোগ এবং সময় পেলেই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতাম। সত্যিই শান্তি পেতাম। দেশের নিয়মমতো, ১৮ বছর বয়স্ক যুবকদের জন্য দু'বছর অস্ত্রশিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি দু'বছর সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্রশিক্ষা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। দু'বছর পর আমি ঘরে ফিরে আসি।

ইতিমধ্যে গোপনে গোপনে ইস্‌কনের দু'চারটা কেন্দ্র আর্মেনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একদিন সেনিক নামে আমার এক বন্ধু আমাকে জানাল যে, সে এখন সম্পূর্ণরূপে ইস্‌কনের ভক্ত। সেনিক আমাকে জানাল যে, ভক্তরা নাকি আমার জন্য অপেক্ষা করছে। একদিন কামিং ব্যাক নামে একটি গ্রন্থ সে আমাকে উপহার দেয়। গ্রন্থটি পড়া মাত্রই আমি ইস্‌কনকে আমার অন্তরের অন্তস্তলে গ্রহণ করি। সারারাত জেগে থেকে গ্রন্থটি আমি বহুবার পড়েছিলাম। মনে হয়েছিল, এ এক দুর্লভ রত্ন।

কিন্তু সেনিক আমাকে বলেছিল, ভক্তরা ধূমপান করে না। এ ছিল আমার কাছে এক মস্ত বড় আঘাত। ভাবতাম, আমি ধূমপান ছাড়তে পারব না। একদিন সেনিক আমাকে একটি ক্যাসেট বাজিয়ে শোনায়। শ্রীমৎ হরিকেশ মহারাজ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী সুরে হরেকৃষ্ণ গাইছিলেন। আমি আরও আকৃষ্ট হলাম। অবশেষে একদিন সেনিকের সঙ্গে আমি ইস্‌কনের গোপন আস্তানায় গিয়ে পৌঁছাই।

সেদিনটি ছিল ১৯৮৪ সালের গৌর পূর্ণিমা। সেনিকের বাড়ি থেকে সাড়ে তিনশ মাইল দূরে অবস্থিত সেই মন্দিরে আমি পৌঁছেছিলাম। মন্দিরটি ছিল একটি সুউচ্চ অট্টালিকার দশতলায়। সেনিক সাঙ্কেতিকভাবে কলিং বেল টেপে। কলিং বেলের বিশেষ শব্দ শুনেই ভক্তেরা বুঝতে পারত, কার আগমন হয়েছে– কেজিবি, না, ভক্ত।

যাই হোক, ভেতরে গিয়ে দেখি, শত শত ভক্ত হরিনাম সংকীর্তনে মেতে উঠেছে। মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথিতে কেজিবির ভয় যেন দূর হয়ে গেছে। মন্দিরে পঞ্চতত্ত্বের আলেখ্য বিরাজিত ছিলেন। সেনিক সেখানে দণ্ডবৎ করল। আমিও করলাম। আমি ভক্তদের কীর্তনে যোগ দিলাম। ভক্তরা কীর্তন বন্ধ করলেও আমি শুধুই হরেকৃষ্ণ গাইছিলাম। ভক্তরাও পুনরায় আমার নেতৃত্বে নাচ গানে মেতে ওঠে।

দীর্ঘকাল কীর্তনের পর ভক্তরা আমাকে একটি ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে একটি প্রসাদের পাহাড় দেখতে পেলাম। সমস্ত ভক্তরা সেদিন উপবাস করছিল। তাঁরা আমাকে যথেষ্ট প্রসাদ পেতে অনুরোধ করে। আমি প্রসাদ পেতে শুরু করি। কী অপূর্ব প্রসাদ। আমার জীবনে এত সুস্বাদু পদ কখনও খাইনি। আমি শুধু খেতেই লাগলাম। পাশাপাশি ভক্তরা সকলে মিলে আমার কাছে কৃষ্ণভাবনা প্রচার করছিল। আমি প্রশ্ন করছিলাম আর খাচ্ছিলাম। প্রসাদের পাহাড় অর্ধেক হয়ে গেল। অবশেষে আমি তাঁদের জানালাম, 'সবই চমৎকার, তবে ধূমপান ছাড়া আমি থাকতে পারব না।'

এই কথা শেষ হতে না হতেই হঠাৎ সেখানে একদল পুলিশ এসে হানা দেয়। তারা আমাদের সকলের নাম ঠিকানা লিখে নেয়। কীর্তন করতে নিষেধ করে তারা চলে যায়।

পুলিশের খাতায় নাম লিখিয়ে, দু'একখানা ছবি উপহার নিয়ে আমি বাড়িতে ফিরে আসি। সেই থেকে আমি সুযোগ পেলেই মন্দিরে যেতাম। আমি নিজেও প্রচার শুরু করি। আমার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুকে আমি মন্দিরে নিয়ে যাই। সে আর বাড়ি ফিরে আসে নি। প্রায় দুমাস পরে আমিও ইস্‌কনের সব নিয়ম মেনে নিয়ে মন্দিরে যোগদান করি।

কিছু দিন যেতে না যেতেই কেজিবি আমাদের সকলকে দু'বছরের জন্য জেলে পাঠায়। পুলিশরা তখন আমাদের প্রচণ্ড মারধর করত। তারা শুধু জানতে চাইত, আমাদের গ্রন্থগুলি কোথায় ছাপানো হচ্ছে। আমরা সকলেই তা গোপন রেখেছিলাম, ফলে পুলিশ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করে। হাতুড়ি দিয়ে আমাদের পায়ের আঙুলগুলি ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দরজার ফাঁকে হাতের আঙুলগুলি নিষ্ঠুরভাবে চেপে ধরত পুলিশ। বিদ্যুতের তারে আমাদের শক লাগানো হত নিয়মিত। একদিন একটি বর্বর পুলিশ আমার মুখের উপর একটি জ্বলন্ত হিটার চেপে

বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

প্রভুপাদের পত্রাবলী

অনুবাদক: শ্রী প্রাণেশ্বর চৈতন্য দাসাধিকারী

(পূর্ব প্রকাশের পর)

সান ফ্রানসিস্‌কো
৩১ মার্চ ১৯৬৭ ইং

প্রিয়, রায়রামা ও সৎস্বরূপ।

আমি তোমাদের পত্র পেয়েছি। পত্রের জন্য ধন্যবাদ ও আমার আশির্বাদ জেনো। বাড়ি ও টাকাটা তোমাদের বোকামির জন্য বেহাত হয়েছে। যদি তা সত্ত্বেও আমি তোমাকে কয়েকটি উপদেশ দিচ্ছি, আমি জানিনা কি ধরনের চুক্তির মধ্যে তুমি ৫০০০ (পাঁচ হাজার) ডলার প্রদান করেছ? তবে আমি ধারনা করছি যে আমাদের পক্ষে মিঃ হিল বাড়িটি ক্রয় করবেন, মিঃ হিলের নিকট থেকে তাতে উল্লেখ ছিল প্রাথমিক ৫০০০ (পাঁচ হাজার) ডলার তিনি অগ্রিম টাকা হিসেবে গ্রহণ করবেন ও বাকি ৫০০০ (পাঁচ হাজার) ডলার ৩১ মার্চের মধ্যে তাঁকে প্রদান করতে হবে। মিঃ পিনে ভালভাবে জানতেন যে, তুমি পরবর্তী ৫০০০ (পাঁচ হাজার) ডলার ৩১ মার্চের মধ্যে প্রদান করতে পারবেন না, ফলে তোমার প্রদেয় ৫০০০ (পাঁচ হাজার) ডলার ঐ ধূর্তলোকেরা আত্মসাত করে ফেলবে।

প্রকৃত পক্ষে মিঃ হিলের ততটা সমর্থ ছিলনা যে তিনি মিঃ টেলরকে ঐ পরিমাণ টাকা দিতে পারেন। তবে মিঃ টেলর এ বিষয়ে হয়তো অবগত ছিল, ঠিক যে কারণে সে ঐ সময়ে উপস্থিত ছিল না এবং উকিলের সহযোগিতায় তোমরা সকলে ঐ দলিলে সাক্ষ্য প্রদান করেছিলে।

আমি তোমাদের বারবার সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে মিঃ টেলর এবং হিলের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত না হওয়ার আগে যেন আমরা চেক না দেই। তোমাদের এই চুক্তিটা অনেকটা বিয়েতে বর কনের উপস্থিতি ছাড়াই যেন বিয়ে সম্পাদিত হয়ে গেল। তবে ভুল হয়ে গেল আর তোমরা সে জন্য অনুশোচনাও করছো।

যাই হোক ৩১ মার্চ মিঃ হিল এবং তার চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত ভুয়া সহযোগীরা যদি দ্বিতীয় মর্টগেজের ২০,০০০ (বিশ হাজার) ডলার নিয়ে এদিকে আসতো এবং দ্বিতীয় কিস্তির ৫০০০ (পাঁচ হাজার) ডলার দাবী করতো তাহলে তা বাতিল হতো না। যদি মিঃ হিল বাড়িটি মিঃ টেলর এর নিকট থেকে ক্রয় করতো এবং এ ক্ষেত্রে যদি উভয়ের মধ্যে লেনদেন থাকতো তাহলে আমরা ৫০০০ (পাঁচ হাজার) ডলার অনতিবিলম্বেই প্রদান করতাম। তবে আমি জানতাম যে মিঃ হিলের কাছে টাকা ছিলনা। এবং মিঃ লারনার আমাকে বলেছিলেন- আমাদের পক্ষে তিনি বাড়িটি ক্রয় করবেন। তার অর্থ হচ্ছে মিঃ পেইন হচ্ছেন একজন প্রতারক দালাল মাত্র। তার অর্থ হচ্ছে এটা একটা প্রতারনা মাত্র, এবং তাদের প্রত্যেকেরই ক্রিমিনাল আইনে শাস্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমি তোমাদের চুক্তির একটা কপি পাঠাতে বলেছিলাম কিন্তু তোমরা তা পাঠাওনি। যদি পাঠাতে তাহলে আমি তোমাদের সঠিক করনীয় জানাতে পারতাম। তথাপিও পত্রের মধ্যে আমি তোমাদের কয়েকটি উপদেশ দিয়েছি। তবে আমি জানি না তোমরা তা কিভাবে মেনে চলবে। যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, মিঃ হিলের বাড়ি ক্রয় করার ক্ষমতাই নেই তাহলে এটা মিঃ পিনের একটা সাজানো প্রতারনার ফাঁদ ছাড়া আর কিছু নয়। যদি ৩১ মার্চ আমরা তাদের চ্যালেঞ্জ করতাম যে, তারা কি মিঃ টেলরের সাথে চুক্তি করেছেকিনা, অথবা তারা কি মিঃ টেলরকে আমাদের দেওয়া ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) ডলার প্রদান করেছে। তা যদি সত্যি হতো যে মিঃ হিল মিঃ টেলরকে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) ডলার দিয়েছে এবং আমরা বাড়িটি পেয়েছি, তাহলে আমরা আগামী পনের দিনের মধ্যে বাকি টাকা প্রদান করতাম। আমি জানি না উকিলরা এ ধরনের কাজ গুরুত্বের সাথে নেন না কেন? যদি হিলের টাকা না থাকে, আমাদের পক্ষে বাড়ি ক্রয় করার জন্য ভান করে টাকা গ্রহন করে তাহলে মিঃ পেইন হচ্ছে এই প্রতারণার মূল হোতা। এই ঘটনাটা যদি সত্যি হয় যে বাড়িটা বিক্রয় করা হচ্ছে, তাহলে আমরা বাকি ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) ডলার প্রদান করতে চাই। হয় আমাদের বাড়ি দেওয়া হোক নয়তো টাকাটি ফেরত দিক। যদি তারা দিতে অপারগ হয় তাহলে আমার ধারনা যে, এটা একটা প্রতারণার ফাঁদ। এখন তোমরা যেমন ইচ্ছা করতে পারো।

শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত ভাষ্য সম্পর্কে যা জানতে চেয়েছ- নগেন রায়কৃত ইংরেজী চৈতন্য চরিতামৃত আমি পড়েছি। তবে এই চরিতামৃতে কোন রকমভাষ্য দেওয়া নেই। তাই এটা করা সহজ। আমি জানিনা কে এই সঞ্জিব চৌধুরী। তবে যাই হোক এই গ্রন্থের অনুবাদ পড়তে কোন অসুবিধা নাই।

মিমোগ্রাফ মেশিন যদি খুব ব্যায়বহুল হয় তাহলে তা পাঠাবার দরকার নেই। রায়রামা তুমি আমেরিকায় গীতোপনিষদ ছাপাবার জন্য কয়েকটা দরপত্র সংগ্রহ কর। যদি তুমি তারাতারি কয়েকটা দরপত্র সংগ্রহ করতে পারো তাহলে সেই দরপত্রের বিস্তারিত পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবো। তাছাড়া তুমি নিম্নে আরো কয়েকটা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে। বিস্তারিত বর্ণনাঃ কেস বাইন্ডিং, পরিমাণঃ পাঁচ হাজার কপি, আকারঃ সাড়ে বার ইঞ্চি বাই সাড়ে নয় সমান্তরাল এবং সাড়ে ছয় বাই সাড়ে নয় ইঞ্চি ভাঁজ করা। পৃষ্ঠার সংখ্যাঃ কভার সহ চারশতের অধিক, কাগজঃ সবচেয়ে ভাল অফসেট কাগজ, কম্পোজিশনঃ ১০ এবং ১২ পয়েন্টের ইটালিকস বর্ণের দ্বারা, ছাপার কাজঃ কালো কালি উভয়পিঠে এবং তিন রং এর ছবি। কভারঃ শিরোনাম অঙ্কিত সোনালী ছাপ পিছন দিকে। দরপত্রঃ প্রত্যেকটি বই, ডেলিভারীঃ সবচেয়ে বেশি সময় দিতে হবে ডেলিভারী করার জন্য নিউ ইর্য়োক, কিছু সময় সান-ফ্রানসিককো এবং স্বল্প সময় মন্ট্রিয়েলে।

তোমরা চেষ্টা কর দরপত্র নেওয়ার এবং বইটি কোথায় ছাপানো হবে তা কি নিউ-ইর্য়োক বা সান-ফ্রানসিস্কোতে জানালে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারবো।

আশাকরি তোমরা সকলে ভাল আছ। লন্ডনে একটি নতুন কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য গর্গমুনি পুনঃ আমাকে উপদেশ দিয়েছে। তবে এই কেন্দ্র স্থাপন করার ক্ষেত্রে সাম্ভাব্যতা আমি আনন্দের সাথে গ্রহণ করছি। আমরা যদি লন্ডনে একটা কেন্দ্র স্থাপন করার পর মন্ট্রিয়েলে একটা কেন্দ্র স্থাপন করতে পারি, তাহলে সেটা হবে আমাদের একটা বড় সাফল্য। আমাকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানাও।

তোমাদের চিরশুভাকাঙ্ক্ষী
এ,সি, ভক্তি বেদান্ত স্বামী

চলবে...

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবত হলো প্রাচীন ভারতের বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের সারাতিসার। পাঁচ হাজার বছর আগে মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস পারমার্থিক জ্ঞানের সারভাগ ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে এই অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। এখানে মূল সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রদত্ত শব্দার্থ, অনুবাদ এবং তাৎপর্য উপস্থাপন করা হলো। এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করা হচ্ছে-

প্রথম স্কন্ধ : "সৃষ্টি"

(পূর্ব প্রকাশের পর)

সপ্তম অধ্যায়

শ্লোক-৭

শৌনক উবাচ

যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥ ৭॥

শব্দার্থ

যস্যাম্- এই বৈদিক শাস্ত্র; **বৈ**-অবশ্যই; **শ্রূয়মাণায়াম্**-কেবলমাত্র শ্রবণ করার ফলে; **কৃষ্ণে**- পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **পরম পুরুষে**-পরম পুরুষ; **ভক্তিঃ**-ভক্তি; **উৎপদ্যতে**-উৎপন্ন হয়; **পুংসঃ**-জীবের; **শোক**-শোক; **মোহ**-মোহ; **ভয়**-ভয়; **অপহা**-যা নিবৃত্ত করে।

অনুবাদ

কেবলমাত্র বৈদিক শাস্ত্র শ্রবণ করার মাধ্যমে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির উদয় হয় এবং তার ফলে শোক, মোহ এবং ভয় তৎক্ষণাৎ অপগত হয়।

তাৎপর্য

অনেক রকমের ইন্দ্রিয় রয়েছে, তার মধ্যে কর্ণেন্দ্রিয় হচ্ছে সব চাইতে সক্রিয়। মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকে, তখনও এই ইন্দ্রিয়টি সক্রিয় থাকে। জাগ্রত অবস্থায় শত্রুর আক্রমণ থেকে নানাভাবে আত্মরক্ষা করা যায়, কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় কেবল কর্ণের দ্বারাই আত্মরক্ষা করা যায়। এখানে জীবনের পরম পূর্ণতা লাভের সম্পর্কে, অর্থাৎ জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়ে শ্রবণের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিটি জীবই সর্বদা শোকগ্রস্ত, তারা নিরন্তর মায়া-মরীচিকার পিছনে ধাবিত হচ্ছে এবং তারা সর্বদাই তাদের কল্পিত শত্রুর ভয়ে ভীত। এগুলিই হচ্ছে ভবরোগের প্রধান লক্ষণ। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী শ্রবণ করার মাধ্যমেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হওয়া যায় এবং তার ফলে তৎক্ষণাৎ ভবরোগের নিরাময় হয়। শ্রীল ব্যাসদেব পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, এবং এই শ্লোকে পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবান যে শ্রীকৃষ্ণ তা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ভগবদ্ভক্তির চরম ফল হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম লাভ করা। 'প্রেম' কথাটি প্রায়ই স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আসক্তির ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রেম বলতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক বোঝায়। ভগবদ্গীতায় জীবকে প্রকৃতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সংস্কৃত ভাষায় প্রকৃতি হচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক। ভগবানকে সর্বদাই পরম পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়। তাই পরমেশ্বর ভগবান এবং জীবের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক তা অনেকটা স্ত্রী এবং পুরুষের সম্পর্কের মতো। তাই প্রকৃত প্রেম হচ্ছে ভগবৎ-প্রেম।

ভগবদ্ভক্তির শুরু হয় ভগবানের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে। ভগবৎ সম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ করা এবং ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ভগবান সর্বতোভাবে পূর্ণ, এবং তাই তাঁর সম্বন্ধে শ্রবণ করার সঙ্গে তাঁর কোনও পার্থক্য নেই। তাই তাঁর মহিমা শ্রবণ করার মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ শব্দ-ব্রহ্মের মাধ্যমে তাঁর সংস্পর্শে আসা যায়। আর এই অপ্রাকৃত শব্দ-তরঙ্গ এতই প্রভাবশালী যে তা তৎক্ষণাৎ সব রকমের জড় আসক্তি দূর করে দেয়, যে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। জীব যখন জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে তখন সে এক রকম জটিলতা প্রাপ্ত হয় তখন সে অলীক জড় দেহের বন্ধনকে বাস্তব বলে মনে করতে শুরু করে। এই ধরনের ভ্রান্ত জটিলতার প্রভাবে জীব বিভিন্ন ধরনের জীবনে বিভিন্নভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এমন কি মানব জীবনের সর্বোচ্চ স্তরেও এই মোহ মতবাদের রূপ নিয়ে ভগবৎ-প্রেমকে আচ্ছাদিত করে রাখে এবং তার ফলে মানুষের মধ্যে বিদ্বেষের বিষ ছড়ায়। শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী শ্রবণ করার ফলে জড়-জাগতিক এই মিথ্যা জটিলতা বিদূরিত হয়, এবং সমাজে যথার্থ শান্তির সূচনা হয়, যা রাজনীতিবিদেরা নানা রকমের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মাধ্যমে লাভ

করার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছেন। রাজনীতিবিদেরা চান যে মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠুক, কিন্তু যেহেতু তারা জড় আধিপত্যের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত তাই তারা মোহাচ্ছন্ন এবং ভীতিগ্রস্ত। তাই রাজনীতিবিদদের শান্তি-সংযম সমাজে শান্তি আনতে পারছে না। তা সম্ভব হবে কেবল শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ করার মাধ্যমে। অজ্ঞ রাজনীতিবিদেরা শত শত বছর ধরে শান্তি–সম্মেলন করে যেতে পারেন, কিন্তু তা কখনও কার্যকরী হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছি, যতক্ষণ আমরা আমাদের জড় দেহটিকে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বলে মনে করে মোহাচ্ছন্ন থাকছি এবং তার ফলে ভীতিগ্রস্ত হয়ে থাকছি, ততক্ষণ আমরা যথার্থ শান্তি লাভ করতে পারব না। শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে শাস্ত্রে শত-সহস্র প্রমাণ রয়েছে। এবং বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, পুরী ইত্যাদি পবিত্র স্থানের অসংখ্য ভক্তের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত শত-সহস্র প্রমাণ রয়েছে। এমন কি কৌমুদী অভিধানে কৃষ্ণের সংজ্ঞা প্রদান করে বলা হয়েছে, যশোদাদুলাল এবং পরমেশ্বর ভগবান পরম ব্রহ্ম। অর্থাৎ কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্কযুক্ত হওয়া যায় এবং তার ফলে জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা, মোহ এবং ভয় থেকে মুক্ত হয়ে পরম পূর্ণতা লাভ করা যায়। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণ করা হচ্ছে কিনা তা এ থেকে বোঝা যায়।

শ্লোক-৮

স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্য চাত্মজম্ ।
শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতং মুনিঃ ॥ ৮॥

শব্দার্থ

সঃ–সেই; **সংহিতাম্**– বৈদিক সাহিত্য; **ভাগবতীম্**–পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয়; **কৃত্বা**–করে; **অনুক্রম্য**–সংশোধন করে এবং পুনরাবৃত্তি করে; **চ**–এবং **আত্মজম্**–তাঁর পুত্র; **শুকম্**– শুকদেব গোস্বামী; **অধ্যাপয়ামাস**–শিক্ষা দান করেছিলেন; **নিবৃত্তি**–নিবৃত্তি মার্গ; **নিরতম্**–নিরত; **মুনিঃ**–মুনি।

অনুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করার পর মহর্ষি বেদব্যাস পুনর্বিচারপূর্বক তা সংশোধন করেন এবং তা তাঁর পুত্র শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে শিক্ষা দান করেন, যিনি ইতিমধ্যেই নিবৃত্তি মার্গে নিরত ছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য যা একই গ্রন্থকার রচনা করেছেন। এই ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-সূত্র নিবৃত্ত মার্গে নিরত মহাপুরুষদের জন্য। শ্রীমদ্ভাগবত এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যে তা শ্রবণ করা মাত্রই মানুষ নিবৃত্ত মার্গে নিরত হতে পারে। যদিও তা বিশেষ করে পরমহংসদের জন্য রচিত, তবুও তা বৈষয়িক মানুষদের হৃদয়ের গভীরেও ক্রিয়া করে। বিষয়ী মানুষেরা সর্বদা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রচেষ্টায় রত, কিন্তু এই ধরনের মানুষেরা এই বৈদিক সাহিত্যটিকে তাদের ভবরোগ নিরাময়ের উপায়-স্বরূপ গ্রহণ করতে পারবে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁর জন্ম থেকেই ছিলেন মুক্ত পুরুষ, এবং তাঁর পিতা তাঁকে শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা দান করেছিলেন। জড় পণ্ডিতদের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের রচনাকাল নিয়ে কিছু মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক থেকে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে তা পরীক্ষিৎ মহারাজের তিরোভাবের পূর্বে এবং শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটের পরে রচিত হয়েছিল। পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাটরূপে সমস্ত পৃথিবী শাসন করেছিলেন, তখন তিনি কলিকে দণ্ডদান করেন। বৈদিক শাস্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনা অনুসারে কলিযুগের শুরু হয় আজ থেকে প্রায় ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) বছর আগে। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত রচিত হয়েছিল ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) বছরেরও আগে। মহাভারত রচিত হয় শ্রীমদ্ভাগবতের আগে এবং পুরাণসমূহ রচিত হয় মহাভারত রচনার আগে। এইভাবে আমরা বিভিন্ন বৈদিক সাহিত্যের রচনাকাল গণনা করতে পারি। বিস্তারিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত রচনার পূর্বে নারদ মুনি তার সারমর্ম ব্যাসদেবকে উপদেশ দিয়েছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে নিবৃত্তি মার্গ অনুশীলন করার বিজ্ঞান। নারদ মুনি প্রবৃত্তি মার্গের নিন্দা করে গেছেন। বদ্ধ জীবেরা প্রবৃত্তি মার্গের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই অনুরক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতেও বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষের ভবরোগ নিরাময়ের ঔষধ অথবা ত্রিতাপ দুঃখ সমূলে উৎপাটন করার পন্থা।

শ্লোক-৯

শৌনক উবাচ

স বৈ নিবৃত্তিনিরতঃ সর্বত্রোপেক্ষকো মুনিঃ ।
কস্য বা বৃহতীমেতামাত্মারামঃ সমভ্যসৎ ॥৯॥

শৌনকঃ উবাচ– শ্রীশৌনক জিজ্ঞাসা করলেন; **সঃ**–তিনি; **বৈ**–অবশ্যই; **নিবৃত্তি**–নিবৃত্তি মার্গ; **নিরতঃ**–নিরত;**সর্বত্র**–সর্বতোভাবে; **উপেক্ষক**–উদাসীন; **মুনিঃ**–মুনি;**কস্য**–কি কারণে;**বা**–অথবা; **বৃহতীম্**–বৃহৎ;

এতাম্‌–এই;আত্মারামঃ–আত্মারাম; সমভ্যসৎ–অধ্যয়ন করতে হয়েছিল।

অনুবাদ

শ্রীশৌনক সূত গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ শ্রীশুকদেব গোস্বামী ইতিমধ্যেই নিবৃত্তি মার্গে নিরত ছিলেন, এবং তার ফলে তিনি ছিলেন আত্মারাম। তা হলে কেন তাঁকে এই বিশাল সাহিত্য অধ্যয়ন করার কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল?

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষের কাছে জীবনের পরম সিদ্ধি হচ্ছে জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে নিরত হয়ে আত্মোপলব্ধির পথে দৃঢ়ব্রত হওয়া। যারা ইন্দ্রিয়-সুখভোগের মাধ্যমে আনন্দ লাভ করতে চায় অথবা যারা জড় দেহের সুখ-সুবিধার চেষ্টায় ব্যস্ত, তাদের বলা হয় কর্মী। এ রকম হাজার হাজার কর্মীর মধ্যে দু'একজন কেবল আত্মজ্ঞান লাভ করার মাধ্যমে আত্মারাম হতে পারেন। 'আত্মারাম' কথাটির অর্থ হচ্ছে, আত্মায় যাঁরা আনন্দ অনুভব করেন। সকলেই আনন্দের অন্বেষণ করছে, কিন্তু একজনের আনন্দের স্তর অপরের আনন্দের স্তর থেকে ভিন্ন হতে পারে। তাই কর্মীদের আনন্দের স্তর আত্মারামের আনন্দের স্তর থেকে ভিন্ন। আত্মারামেরা সর্বতোভাবে জড় সুখভোগের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ইতিমধ্যেই সেই স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি মহান সাহিত্য শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন যে সমস্ত আত্মারামেরা, তাঁদেরও অধ্যয়নের বিষয়।

শ্লোক-১০

সূত উবাচ

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥১০॥

সূতঃউবাচ–সূত গোস্বামী বললেন; **আত্মারামাঃ**–আত্মারাম; **চ**–ও; **মুনয়ঃ**–ঋষিরা; **নির্গ্রন্থাঃ**–সমস্ত বন্ধনমুক্ত; **অপি**–সত্ত্বেও; **উরুক্রমে**–মহা বিক্রমশালী ভগবান; **কুর্বন্তি**–করেন; **অহৈতুকীম্‌** অহৈতুকী; **ভক্তিম্‌**–ভক্তি; **ইত্থম্‌-ভূত**–এমন অদ্ভুত; **গুণঃ**–গুণাবলী; **হরিঃ**–ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

শ্রী সূত গোস্বামী বললেন, সমস্ত আত্মারামেরা, বিশেষ করে যাঁরা নিবৃত্তি মার্গে নিরত, সব রকমের জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবানের অহৈতুকী ভক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। পরমেশ্বর ভগবান দিব্য গুণাবলীতে বিভূষিত এবং তাই তিনি সকলকে আকর্ষণ করেন, এমন কি মুক্ত পুরুষদেরও।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর প্রধান ভক্ত শ্রীল সনাতন গোস্বামীর কাছে এই আত্মারাম শ্লোকটি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেন; তিনি এই শ্লোকে এগারটি তত্ত্ব উল্লেখ করেন, যথা–১) আত্মারাম, ২) মুনয়ঃ, ৩) নির্গ্রন্থ, ৪) অপি, ৫) চ, ৬) উরুক্রম, ৭) কুর্বন্তি, ৮) অহৈতুকীম্‌, ৯) ভক্তিম্‌, ১০) ইত্থম্ভূতগুণ এবং ১১) হরিঃ। বিশ্বকোষ সংস্কৃত অভিধানে 'আত্মারাম' শব্দটির সাতটি অর্থ রয়েছেঃ যথা–১) ব্রহ্ম, ২) দেহ, ৩) মন, ৪) যত্ন, ৫) ধৃতি, ৬) বুদ্ধি এবং ৭) স্বভাব।

'মুনয়ঃ' শব্দটির অর্থ হচ্চে–১) মননশীল, ২) গম্ভীর এবং মৌন, ৩) তপস্বী, ৪) ব্রতী, ৫) যতি, ৬) ঋষি এবং ৭) মুনি।

নির্গ্রন্থ শব্দটির অর্থ হচ্ছে–১) অবিদ্যা থেকে মুক্ত, ২) বিধি-নিষেধ, বেদশাস্ত্র জ্ঞানাদিবিহীন, অর্থাৎ নীতি, বেদ, দর্শন, আদি শাস্ত্রজ্ঞানরহিত (অর্থাৎ মূর্খ, নিচ, ম্লেচ্ছ আদি শাস্ত্র-নির্দেশের সঙ্গে সম্পর্করহিত মানুষ), ৩) ধন সঞ্চয়ী এবং নির্ধন।

বিশ্বকোষ অভিধান অনুসারে, নি উপাঙ্গটি ১) নিশ্চয়ার্থে, ২) নিষ্ক্রমার্থে, ৩) নির্মাণার্থে এবং ৪) নিষেধার্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং গ্রন্থ শব্দটি ধন, সন্দর্ভ, বর্ণ সংগ্রহ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

উরুক্রম শব্দটির অর্থ 'যাঁর কার্যকলাপ মহিমামণ্ডিত' ক্রম মানে হচ্ছে 'পদক্ষেপ'। এই উরুক্রম শব্দটি বিশেষ করে বামনদেব রূপে ভগবানের অবতারের দ্যোতক, যিনি তাঁর দুটি পদক্ষেপের দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে আবৃত করেছিলেন। ভগবান বিষ্ণু অনন্ত শক্তিসম্পন্ন, এবং তাঁর কার্যকলাপ এতই মহিমামণ্ডিত যে তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা চিজ্জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা জড় জড়ৎ সৃষ্টি করেছেন। সর্বব্যাপ্ত হওয়ার ফলে পরম সত্যরূপে তিনি সর্বত্রই বিরাজমান, এবং তাঁর স্বরূপে তিনি নিত্য গোলাক বৃন্দাবনে বিরাজ করেন, যেখানে তিনি সমস্ত বৈচিত্র্য সমন্বিত তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাস করেন। অন্য কারও কার্যকলাপের সঙ্গে তাঁর কার্যকলাপের তুলনা করা যায় না, এবং তাই 'উরুক্রম' শব্দটি কেবল তাঁর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে 'কুর্বন্তি' অর্থে বোঝায় অন্য কারোর জন্য কিছু করা। তাই, এক অর্থ হচ্ছে আত্মারামেরা পরমেশ্বর ভগবান উরুক্রমের আনন্দ বিধানের জন্য তাঁর সেবা করেন, তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়।

'হেতু' কথাটির অর্থ হচ্ছে 'কারণ'। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির

বহু কারণ রয়েছে, এবং সেগুলি জড় ভোগ, যোগসিদ্ধি এবং মুক্তি—এই তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যা সাধারণত উন্নতিকামী মানুষেরা আশা করেন। জড় ভোগ অসংখ্য রকমের রয়েছে, এবং জড়বাদীরা সেগুলি অধিক থেকে অধিকতর করতে আগ্রহী, কেন না তারা মায়াশক্তির দ্বারা প্রভাবিত। জড় সুখভোগের শেষ নেই, এমন কি এই জড় ব্রহ্মাণ্ডে এমন কেউ নেই যার সেই সবগুলি রয়েছে। যোগসিদ্ধি আট রকমের (যেমন অত্যন্ত ক্ষুদ্র হয়ে যাওয়া, অত্যন্ত লঘু হয়ে যাওয়া, বাসনা অনুসারে যা কিছু প্রাপ্ত হওয়া, জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করা, অন্য জীবদের বশীভূত করা, পৃথিবীকে কক্ষচ্যুত করে মহাশূন্যে নিক্ষেপ করা ইত্যাদি)। এই সমস্ত যোগসিদ্ধির কথা শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে। মুক্তি পাঁচ রকমের।

সুতরাং অনন্য ভক্তি বলতে বোঝায় পূর্বোক্ত এই সমস্ত ব্যক্তিগত লাভের আশা রহিত হয়ে ভগবানের সেবা করা। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যক্তিগত বাসনা রহিত এই ধরনের অনন্য ভক্তদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রীত হন।

ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তির বিভিন্ন স্তর রয়েছে। জড়-জাগতিক স্তরে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের একাশিটি বিভিন্ন গুণ রয়েছে, এবং এই ধরনের সেবার উর্ধ্বে রয়েছে চিন্ময় ভগবদ্ভক্তি, যাকে বলা হয় সাধনভক্তি। সাধানভক্তির ঐকান্তিক অনুশীলন যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তখন তা প্রেমভক্তিতে পরিণত হয়। প্রেমভক্তি নয় প্রকার—রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব এবং মহাভাব।

শান্ত ভক্তের রতি 'প্রেম' পর্যন্ত বাড়ে। দাস্য ভক্তের রতি 'রাগ' পর্যন্ত বিকশিত হয় এবং সখ্য ভক্তের রতি 'অনুরাগ' পর্যন্ত। বাৎসল্য ভক্তের রতিও 'অনুরাগ' পর্যন্ত আর মাধুর্য ভক্তের রতির সীমা হচ্ছে 'মহাভাব' পর্যন্ত। এইগুলি পরমেশ্বর ভগবানের অনন্য ভক্তির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য।

হরিভক্তি সুধোদয় গ্রন্থে 'ইত্থম্ভূত' শব্দটির অর্থ 'পূর্ণ আনন্দ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে ব্রহ্মানন্দকে গোষ্পদে সঞ্চিত জলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, ভগবৎ প্রেমানন্দ সিন্ধুর সঙ্গে তার কোন তুলনাই হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ রূপ এতই সুন্দর যে তাঁর মধ্যে সমস্ত আকর্ষণ, সমস্ত আনন্দ এবং সমস্ত রস রয়েছে। এই আকর্ষণ এতই প্রবল যে তার আভাসেই ভুক্তি, মুক্তি এবং সিদ্ধির সুখ মানুষ বর্জন করে। এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তির প্রয়োজন হয় না, কেন না জীব স্বাভাবিকভাবেই শ্রীকৃষ্ণের গুণের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমাদের এখানে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে শ্রীকৃষ্ণের গুণের সঙ্গে জড় গুণের কোন সম্পর্ক নেই, কেন না তা সবই হচ্ছে সচ্চিদানন্দময়। শ্রীকৃষ্ণের গুণ অনন্ত এবং একজন একটি গুণের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন এবং অপরে অন্য গুণের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন।

সনক, সনাতন, সনন্দ এবং সনৎকুমার—এই চারজন মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পিত ফুল, তুলসী এবং চন্দনের সৌরভে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তেমনই, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ভগবানের লীলা শ্রবণ করে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শুকদেব গোস্বামী ইতিমধ্যেই মুক্ত স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি ভগবানের লীলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তার থেকে প্রমাণিত হয় যে তাঁর লীলার সঙ্গে জড়-জাগতিক কার্যকলাপের কোন সম্পর্ক নেই। ঠিক তেমনই ব্রজগোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের রূপে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এবং রুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ করে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বংশী-গীতে লক্ষ্মীদেবীরও মন হরণ করেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি জগতের সমস্ত যুবতীর মন হরণ করেন। বাৎসল্য রসের দ্বারা তিনি বয়স্কা মহিলাদের চিত্ত আকর্ষণ করেন এবং দাস্য রসে এবং সখ্য রসে পুরুষদের মন আকর্ষণ করেন।

'হরি' শব্দটির অনেক অর্থ রয়েছে। কিন্তু তার দুটি মুখ্য অর্থ হল— তিনি সর্ব অমঙ্গল হরণ করেন এবং প্রেম দান করে তিনি মন হরণ করেন। গভীর দুঃখে কেউ যদি ভগবানকে স্মরণ করেন তা হলে তিনি সব রকমের দুঃখ-দুর্দশা এবং উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হতে পারেন। ভগবান ধীরে ধীরে শুদ্ধ ভক্তের অনুশীলনের সমস্ত বিঘ্ন দূর করেন এবং শ্রবণ-কীর্তন আদি নবধা অনুশীলনের ফলস্বরূপ 'প্রেম' প্রকাশ করেন।

তাঁর স্বীয় গুণ এবং অপ্রাকৃত কার্যকলাপের দ্বারা ভগবান শুদ্ধ ভক্তের চিত্তকে সর্বতোভাবে আকর্ষণ করেন। এমনই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ-শক্তি। তাঁর আকর্ষণ এতই প্রবল যে শুদ্ধ ভক্ত ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্বর্গের প্রতিও আর আকৃষ্ট হন না। এমনই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত আকর্ষণ। আর সেই সঙ্গে 'অপি' এবং 'চ' এই শব্দ দুটি যুক্ত হওয়ার ফলে তার অর্থ অন্তহীনভাবে বর্ধিত হয়েছে। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে অপি শব্দটির সাতটি অর্থ রয়েছে।

এইভাবে এই শ্লোকের প্রতিটি শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করে শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত গুণাবলী সম্বন্ধে জানা যায়, যা তাঁর শুদ্ধ ভক্তের চিত্তকে আকর্ষণ করে।

চলবে...

আদর্শ গৃহস্থ জীবন লাভের উপায়

গৃহস্থ হওয়ার ঝুঁকি

সকলেই ব্রহ্মচারী হয়ে থাকতে পারেন। যাঁরা ততটুকু সমর্থ নন, তাঁরা বিবাহ করতে পারেন। কিন্তু ভাবী গৃহস্থ যেন নিশ্চিতভাবে জেনে রাখেন যে, সামনে সমস্যাসঙ্কুল জীবন অপেক্ষা করছে। সর্বদাই একটা না একটা সমস্যা গৃহস্থ জীবনে লেগেই থাকবে-গৃহস্থ হওয়ার আগেই এটা নিশ্চিতরূপে প্রত্যাশা করা আবশ্যক। সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে, স্বামী-স্ত্রী আর সন্তান-সন্ততি-সকলেই দুঃখে জর্জরিত। তবুও গৃহমেধীরা কেবলই সন্তান উৎপাদন করে চলেছেন। কাম উপভোগ মানেই দুঃখ আর সমস্যা। তাই ধীর হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কামের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে অধীর হওয়া উচিত নয়।

এক সময় শ্রীল প্রভুপাদও বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। প্রথম দিকে অনেক সহজেই তিনি গৃহস্থ হওয়ার অনুমতি দিতেন এবং সেই সমস্ত গৃহস্থরা আশ্রমবাসী হয়েই প্রচার করতেন। প্রভুপাদ যখন দেখলেন যে, কিছু কিছু গৃহস্থ আশ্রমের সেবা করার পরিবর্তে শুধু সমস্যারই সৃষ্টি করছে, তখন তিনিও অনেক কঠোর হয়ে ওঠেন। একটি চিঠিতে তিনি বলেন-

"এখন থেকে যারাই বিবাহ করার প্রস্তাব নিয়ে আসবে, তাদেরকে অবশ্যই বাইরে থেকে কিছু উপার্জন করতে হবে। বিবাহের আগেই এ কথা জানা আবশ্যক। গৃহস্থ আশ্রমের সমস্ত বোঝা বহন করার জন্য তাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে। যারা বিবাহ করতে ইচ্ছুক, তারা তা করতে পারে, তবে এ ব্যাপারে সমস্ত ঝুঁকিই তাদের নিজেদেরকেই নিতে হবে। আমি আর অধিক অনুমোদন দিতে পারব না। আমার গুরুমহারাজ কখনই তা অনুমোদন করেননি। কিন্তু আমি যখন তোমাদের দেশে আসি, তখন এক বিশেষ পরিস্থিতিতে আমি এই বাড়তি সুবিধাটুকু দিয়েছিলাম। আমারও আর অধিক অনুমতি দেওয়ার ইচ্ছা নেই। আমি অনুমোদন করব না। তবে গৃহস্থ আশ্রম যে সর্বদাই সমস্যাসঙ্কুল, এ কথা জেনে নিজের ঝুঁকিতে তারা বিবাহ করতে পারে।

নারীর সতীত্ব

বৈদিক যুগে বিবাহ-বিচ্ছেদ ছিল একটি অর্থহীন শব্দ। তখনকার গৃহস্থরা স্বপ্নেও বিবাহ-বিচ্ছেদ করতেন না। পরিবার জীবনের সেই স্থিতিশীলতার মূলে প্রধান ভূমিকা ছিল নারীর।

বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সতীত্বকে এক মহামূল্যবান মণির মতোই সংরক্ষণ করা হত। কারও ঘরে যদি কোনও মূল্যবান মণিরত্ন থাকে, তা হলে সহজেই চোর-ডাকাতেরা আকৃষ্ট হয়। তাই বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত পিতা তাঁর কন্যাকে পরম নিরাপদে রক্ষা করতেন। মহামূল্যবান মণিরত্নের মতোই তাঁকে অন্তঃপুরে কালযাপন করতে হত, যাতে সুযোগসন্ধানী শৃগালেরা তাঁর সতীত্ব হরণের সুযোগ না পায়। এমনকি, বিবাহিত মহিলারাও অন্তঃপুরে থাকতেন। কদাচিৎ আবৃত পাল্কীতে করে সুরক্ষিত অবস্থায় সসম্মানে বাইরে যেতেন। অবিবাহিত মেয়েদের খুব অল্প বয়সেই পাত্রস্থ করা হত। সাধারণত ৮ থেকে ১১ বছর বয়সের মধ্যেই মেয়েদের বিয়ে হত। এর ফলে স্ত্রী হত অত্যন্ত সতী এবং পতিব্রতা। বাল্যকালে সে যাকে স্বামী রূপে বরণ করত, বিবাহের প্রথম রাত থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, সে তাকে ক্ষণকালের জন্যও ভুলতে পারত না। কেননা বাল্যকালে স্বাভাবিকভাবেই তারা নির্মল চরিত্র এবং নিষ্কপট। তাই তাদের সতীত্বের কোনও তুলনা হত না। তারা তাদের নিষ্কপট হৃদয়ে স্বামীকে এত গভীরভাবে ভালবাসত যে, স্বামীর মৃত্যুর পর বেঁচে থাকা তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হত। স্বেচ্ছায় তারা সতীদাহ বরণ করত।

অবশ্য এখন আর আমরা সেই যুগের পরিবেশ প্রত্যাশা করি না। তবে নারীর সতীত্বকে রক্ষা করার যথাসাধ্য চেষ্টা অভিভাবকদের করতে হবে। সেই দিকে গুরুত্ব দিতে হলে, মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। বাঁশ যখন শক্ত এবং হলদে হয়ে যায়, তখন তা আর নমনীয় থাকে না। ঠিক তেমনি অধিক বয়সে বিবাহিত মেয়েরা প্রায়শই স্বামীর সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না। সতীত্বেরও অভাব হয়। ফলে সহজেই ঘটে বিবাহ-বিচ্ছেদ।

ছবিতে ছোটদের দশ অবতার

পাহাড় উত্তোলন করার কাজ শুরু করল

কুর্ম অবতার

কিন্তু তারা যখন পর্বতটা অর্ধেক আনতেই–
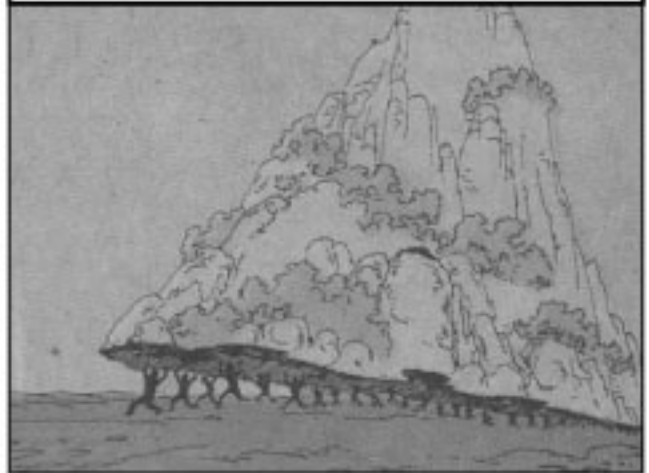
সেই প্রকান্ড পর্বত পড়ে অনেক সৈন্য মারা গেল– অনেক অসুর এবং দেবতা পর্বতের নিচে পিষ্ট হলো। মহারাজ ইন্দ্র খুব ক্রুদ্ধ হলেন।

মহারাজ ইন্দ্র প্রার্থনা করার পূর্বেই স্বয়ং প্রভু সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

শুধুমাত্র তাঁর সদয় দৃষ্টিপাতের দ্বারা তিনি দেবতাদের রক্ষা করলেন।

মন্দরা পর্বত গরুড় কর্তৃক নিরাপদে সমুদ্র তীরে পৌঁছানোর পর ভগবান বিষ্ণু গরুড়ের দিকে তাকালেন।
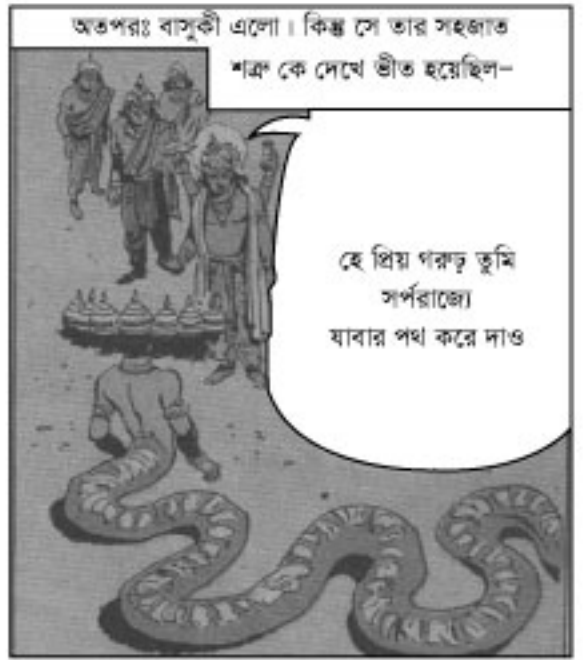
অতপরঃ বাসুকী এলো। কিন্তু সে তার সহজাত শত্রু কে দেখে ভীত হয়েছিল–
হে প্রিয় গরুড় তুমি সর্পরাজ্যে যাবার পথ করে দাও

আর যখন সে দেখলো যে গরুড় উড়ে যাচ্ছে– বাসুকী তখনই বিষ্ণুর আদেশ পালন করলো।
বাসুকী তুমি তোমার কর্তব্য সম্পালন কর। তাহলে অমৃতের ভাগ পাবে। এবং মন্দরা পর্বতের ধাঁরালো অংশ দ্বারা তুমি আঘাত প্রাপ্ত হবে না মোটেই।

এরকম নিশ্চয়তা পেয়ে– বাসুকী মন্দরা পর্বতের চারদিক জড়িয়ে ফেললো। দেখ– এখানে আমরা সকলে প্রস্তুত হে বন্ধুরা ভায়েরা তোমরা এসো– আমাদের সর্ব শক্তি দিয়ে মন্থন করি– আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য।

অতপরঃ সে সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করলো–

● অনুবাদক: প্রাণেশ্বর চৈতন্য দাস

● চলবে......
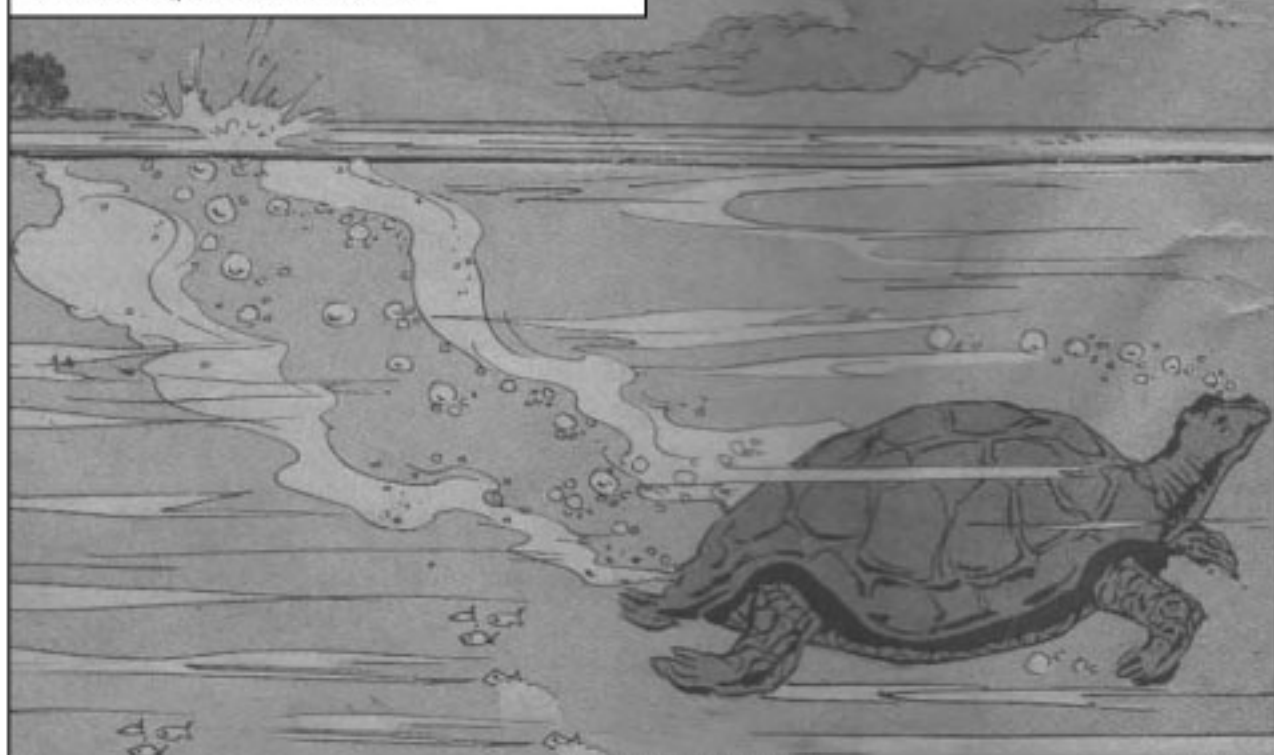
উপদেশে উপাখ্যান

ফর্দ্দ অনুসারে গুরু সেবা

এক গুরুদেব তাঁর শিষ্যকে নিয়ে একটি ঘোড়ায় চেপে ভ্রমণ করতে বের হলেন। যেতে যেতে ঘোড়ার পিঠ থেকে গুরুদেবের চাদরটি পড়ে যেতে দেখে শিষ্যটি ভ্রুক্ষেপও করল না। কিছুক্ষণ পর গুরুদেব বললেন "আমার চাদর কোথায়?" শিষ্য বলল- "চাঁদরটি রাস্তায় পড়ে গেছে।" গুরুদেব বললেন- "দুর বোকা। চাদরটি তুলে নিবি তো। যাক, এখন থেকে যা পরবে তুই তা তুলে নিবি।" কিছুদূর যাওয়ার পর ঘোড়াটি পায়খানা করতে লাগল। শিষ্যটি তখন বলল, "গুরুদেব একটু দাঁড়ান।" গুরুদেব বললেন- "কেন"? কি হয়েছে?" শিষ্যটি তৎক্ষণাৎ নেমে গিয়ে হাতে করে ঘোড়ার পায়খানা তুলে নিয়ে বলল-"গুরুদেব"এই নিন। গুরুদেব বললেন- "বোকা, ফেলে দিয়ে হাত ধুয়ে আয়।" শিষ্যটি বলল "ঘোড়ার" উপর থেকে কি কি জিনিস পড়ে গেলে তুলতে হয়, তার একটি ফর্দ আমায় করে দিন।" গুরুদেব ফর্দ করে দিলেন- "কাপড়, চাদর, ছাতা, জামা, ব্যাগ, জুতো আসন" ইত্যাদি। কিছুদূর যাওয়ার পর পথের মধ্যে একটি গর্ত দেখে ঘোড়াটি লাফ দেওয়ার ফলে গুরুদেব গর্তের মধ্যে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। শিষ্য তখন ফর্দ অনুযায়ী সমস্ত জিনিসপত্র একত্র করতে লাগল। কাপড়, জামা, ব্যাগ, ছাতা, চাঁদর এমনটি গুরুদেবের অঙ্গ থেকে সবকিছু খুলে নিয়ে গুরুদেবকে উলঙ্গ অবস্থায় রেখে দিল। অনেকক্ষণ পর গুরুদেবের জ্ঞান আসতে তিনি বললেন,- 'আমাকে ধরে তোল।" শিষ্যটি বলল- 'ফর্দে আপনার তোলার কথা নাই। সুতরাং আমি আপনাকে কি প্রকারে তুলব?" গুরুদেব বললেন,-ওরে, আমার পরনের কাপড় কি হল?" শিষ্য বলল- 'ফর্দ অনুসারে সব গুছিয়ে রেখেছি।"

হিতোপদেশ

ফর্দ অনুসারে গুরু বৈষ্ণব ভগবানের সেবা হয় না। যা করলে গুরু বৈষ্ণব ভগবানের সুখ হয় তার নাম প্রেমময়ী সেবা। গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে প্রেমময়ী সেবার দ্বারায় গৌরগোবিন্দের সেবা করাই আত্মার বৃত্তি।

গুরুসেবা

একজন গুরুদেব তাঁর অতি প্রিয়তম এক শিষ্যকে দুই টাকা দিয়ে বললেন, "বাজার থেকে চারটি রসগোল্লা কিনে আনো। দেখো, যেন বাসী না হয়।" শিষ্যটি বাজারে গিয়ে এক দোকানদারকে দুই টাকা দিয়ে বলল, 'আমার চারটি রসগোল্লা দিন।" শিষ্যটি রসগোল্লাগুলি নিয়ে আশ্রমের দিকে রওনা হলো। পথে আসতে আসতে চিন্তা করল, গুরুদেব তাকে বলে দিয়েছেন, "রসগোল্লা যেন বাসী না হয়।" কিন্তু রসগোল্লা কেমন তাতো দেখা হল না।" এইরূপ ভেবেই শিষ্যটি রসগোল্লা মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। খেয়ে দেখল'রসগোল্লাতো বেশ ভাল।" আবার পথ চলতে শুরু করল। কিছুদূর আসার পর চিন্তা করল, "তিনটিতো আছে। গুরুদেবতো আমার আরাধ্য দেবতা, আমি তাঁর হাতে তিনটি দিই কি করে? তিনটি দেয় শত্রুকে।" এই ভেবেই আর একটি রসগোল্লা খেয়ে নিল। খেয়ে নিয়ে চিন্তা করল "এখন আমার হাতে দুটো আছে। আমি গুরুদেবকে যা দিই তার অর্ধেক আমার জন্য রাখেন। তাহলে আমার ভাগেরটা আমি খেয়ে নিই।" এই ভেবে শিষ্যটি রসগোল্লাটি খেয়ে নিয়ে চিন্তা করল গুরুদেবের এই একটাই প্রাপ্য। এই ভেবে শিষ্যটি রসগোল্লা গুরুদেবকে দিল। গুরুদেব দেখেই বললেন, "এ-কি-রে? একটা রসগোল্লা কেন? " শিষ্যটি বলল- "গুরুদেব! আমি বিচার করে দেখলাম আপনি একটাই পাবেন।" গুরুদেব বললেন, "কি রকম?" শিষ্য বলল "কেন ? আপনি বলেছিলেন পরীক্ষা করে দেখতে! পরীক্ষা করতে গিয়ে একটি খেলাম। তিনটি কোন প্রিয়জনের হাতে দিতে নেই। আপনি আমার আরাধ্য দেব। আপনাকে দিই কি করে? তাই আমি আর একটি খেয়ে নিলাম। তারপর চিন্তা করলাম, যা কিছু হয়, তার অর্ধেক আমায় দেন। তাই আমার ভাগটা আমি খেয়ে নিলাম।" গুরুদেব বললেন-"আরে, বোকা! তুই খেলি কি করে?" শিষ্যটি হাতে রসগোল্লাটি নিয়ে "ঠিক এই ভাবেই খেলাম।" বলেই নিজের মুখের মধ্যে ফেলে দিল। গুরুদেব শিষ্যের সেবা দেখেই অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

হিতোপদেশ

কিছু শিষ্যবর্গ তারা মঠ মন্দিরে গুরুদেবের কাছে আসে; গুরুদেবের বিত্ত অপহরণের জন্য। গুরুদেবের আসন পাওয়ার জন্য লাভ, যশ, প্রতিষ্ঠার জন্য। কিছু সংখ্যক শিষ্য ছাড়া সকলেই গুরুদেবের সেবার পরিবর্তে গুরুদেবের শোষণ ও নিজের ইন্দ্রিয় সেবায় ব্যস্ত হয়। প্রকৃত আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করতে হলে কায়, মন, বাক্য, অর্থ ও বুদ্ধি দ্বারা সম্যকরূপে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে শরণাগত হয়ে সেবা করাই একমাত্র কাম্য।

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করুন এবং সুখী হোন- শ্রীল প্রভুপাদ

আপনাদের প্রশ্ন আমাদের উত্তর

১। প্রশ্ন : সকলে বলে ভগবান আছেন। ভগবান থাকলে দেশে এত দুঃখ কষ্ট কেন?

প্রশ্নকর্তাঃ বসুদেব চন্দ্র রায়, ডোংগা, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

উত্তর ঃ আপনার দেশে দুঃখকষ্ট থাকা না থাকার উপর ভগবানের অস্তিত্ব নির্ভর করে না। সৃষ্টি আছে মানেই স্রষ্টা আছেন। ভগবানের প্রতি বিমুখ হওয়ার ফলেই জীব এই দুঃখকষ্টের জগতে এসেছে। তাই দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে।

কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব অনাদি বহির্মুখ
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥

ভগবানের নির্দেশ হচ্ছে, এই জগৎটাকে দুঃখকষ্ট দিয়েই তৈরি। তাই কৃষ্ণভজনের মাধ্যমে পরমানন্দময় ধামে উন্নীত না হওয়া অবধি এখানে দুঃখকষ্টই পেতে হবে।

২। প্রশ্ন : আমার বাড়িতে একটি কালো তুলসীর বৃক্ষ আছে। প্রতিবেশীগণ বলেছেন, বাড়িতে কালো তুলসীর বৃক্ষ রাখা উচিত নয়। এই সম্বন্ধে শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত কি?

প্রশ্নকর্তাঃ রেনুকা রাণী সরকার, পূর্ব রাজাবাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ কালো তুলসীকে শুদ্ধ ভাষায় কৃষ্ণতুলসী বলা হয়। তুলসী ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। কি কৃষ্ণতুলসী কি গৌরতুলসী সকল বর্ণের তুলসীই মাহাত্ম্যপূর্ণ। 'কালো তুলসী বাড়িতে রাখা উচিত নয়'- এই কথা যাঁরা বলছেন, তাঁরা নিতান্তই অজ্ঞ।

শ্রীবিষ্ণুরহস্য বলা হয়েছে-

কৃষ্ণং কৃষ্ণতুলস্যা হি যো ভক্ত্যা পূজয়েন্নরঃ
স যাতি ভুবনং শুভ্রং যত্র বিষ্ণুঃ শ্রিয়া সহ॥

অর্থাৎ, "যিনি কৃষ্ণবর্ণ তুলসী দ্বারা ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করেন, লক্ষ্মীসহ বিষ্ণু যথায় বিরাজ করেন, সেই বিমল ধামে তাঁর গতি হয়।

শ্রীপদ্মপুরাণে উল্লেখ রয়েছে-

তুলসী কৃষ্ণ-গৌরাভা তয়াভ্যর্চ্য জনার্দনং।
নরো যাতি তনুং ত্যক্ত্বা বৈষ্ণবীং শাশ্বতীং গতিং॥

অর্থাৎ, "যিনি কৃষ্ণবর্ণ ও গৌরবর্ণ বিশিষ্ট তুলসীপত্র দ্বারা ভগবান শ্রীহরির অর্চনা করেন, সেই মানব দেহত্যাগের পর হরিধামে প্রস্থান করেন।"

৩। প্রশ্ন : দামোদর কথার অর্থ কি? দামোদর ব্রততে প্রদীপ দান করা হয় কেন? তাহা জানতে চাই।

প্রশ্নকর্তাঃ নারায়ণ দাস (চৌধুরী), ২৫ দয়াগঞ্জ জেলেপাড়া, ঢাকা।

উত্তরঃ 'দাম' মানে রজ্জু বা দড়ি এবং 'উদর' মানে পেট। কোনও দড়ি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধবার ক্ষমতা কারও নেই। মা যশোদা ঘরের সমস্ত দড়ি জড়ো করে শিশুপুত্র কৃষ্ণকে তাঁর দুষ্টুমির জন্য বাঁধতে গিয়েছিলেন। কিন্তু দড়ি বারে বারেই ছোট হয়ে যাচ্ছিল। অদ্ভুত পুত্রের উদরের সীমা পরিসীমা বুঝি মায়ের বুদ্ধিতে আসে না। বহু দড়ি গাঁট দিয়ে বেঁধেও শিশুপুত্রের উদর বেষ্টন করা গেল না। যেরকম দড়ি, সেই রকম উদর। দুটোই মায়ের কাছে বেকায়দা বলে বোধ হচ্ছিল। অবশেষে শান্তি লাঘব করতে কৃষ্ণ নিজেই বাঁধা পড়লেন। দাম বেষ্টিতে উদর বলে শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম দামোদর।

প্রদীপদান মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে বলেছিলেন- "হে নারদ, সমস্ত পাপে পাপী হয়েও মানুষ পবিত্র হতে পারে, যদি সে ভক্তিভরে কার্তিক মাসে ভগবান শ্রীহরির সম্মুখে ঘৃত প্রদীপ দান করে। দীপের আলোকে তার সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়ে যায়। সে শুদ্ধ হয়ে ভগবানের নিত্য সেবায় উন্নীত হয়।" (শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৬/৪৭)।

৪। প্রশ্ন : 'রাধা-কৃষ্ণ' 'রাধা-গোবিন্দ' 'রাধা-মাধব' ইত্যাদি কথা গুলোর 'রাধা' শব্দটি প্রথমে ব্যবহৃত হচ্ছে কেন? এতে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য খর্ব করা হচ্ছে না? আমরা তো শিব-দুর্গা, হর-পার্বতী বলি, তেমনই কৃষ্ণ-রাধা বললে ক্ষতি কি?

প্রশ্নকর্তাঃ কৃষ্ণ কান্তি সরকার (ইংরেজী শিক্ষক) বক্সনগর উচ্চ বিদ্যালয়, বক্সনগর, নবাবগঞ্জ, ঢাকা- ১৩২০।

উত্তরঃ পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গ শ্রেষ্ঠ আরাধিকা শক্তির পাদপদ্মে আগে আশ্রয় নেওয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের রীতি। এতে ভগবান কৃষ্ণ আরও বেশি প্রীত হন। শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণী কিংবা অন্তরঙ্গ ভক্ত ছাড়া কারও কাছে সরাসরি সেবা গ্রহণ করতে চান না। এই তত্ত্ব অবগত হয়ে ভক্তরা আগেই রাধারাণীর নাম উল্লেখ করেন। পরম বৈষ্ণব শিব ঠাকুর দেবর্ষি নারদকে নির্দেশ দিয়েছেন?

আদৌ সমুচ্চরেদ্ রাধাং পশ্চাৎ কৃষ্ণং চ মাধবম্।
বিপরীতং যদি বদেৎ ব্রহ্মহত্যাং লভেদ্ ধ্রুবম্ ॥

"প্রথমেই 'রাধা' শব্দ উচ্চারণ করবে, তারপর 'কৃষ্ণ' শব্দ উচ্চারণ করবে। যদি এর বিপরীত কেউ বলে, তবে সে ব্রহ্মহত্যার পাপ প্রাপ্ত হয়।" (শ্রীনারদপঞ্চরাত্র ৫/৬/৬)

৫। প্রশ্ন : আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়া কি পিতা-মাতার কৃপা ছাড়া সম্ভব?

প্রশ্নকর্তা: আশীষ কুমার সরকার, উপ-সচিব, অর্থমন্ত্রণালয়।
উত্তরঃ আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রায় পথে মাতা-পিতার কৃপাশীর্বাদ থাকতেও পারে, আবার না-ও থাকতে পারে। সেটি কোনও বড় কথা নয়। শাস্ত্রে বহু পিতা-মাতাকে দেখা যায় যারা সন্তানকে ভগবদ্ভক্তির পথ থেকে বিচ্যুত করবার জন্যই ব্যস্ত। যেমন, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিপরায়ণ ভরতকে মাতা কৈকেয়ী রাজ্য ভোগ করবার সুযোগ দিয়েছিলেন এবং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে গৃহছাড়া করিয়েছিলেন। শিশুপুত্র প্রহ্লাদকে শ্রীহরির নাম ও মহিমা কীর্তন করতে দেখে পিতা হিরণ্যকশিপু শ্রীপ্রহ্লাদের উপর বহু রকমের জঘন্য অত্যাচার চালিয়েছিলেন।
এই যুগের অধিকাংশ মাতা-পিতাই চায় না যে, তাদের সন্তানেরা হরিভজন করে জীবন ধন্য করুক। বরং কেউ যদি মঠবাসী হয়ে কৃষ্ণভজনে জীবনযাপন করতে আসে, তো মাতা-পিতার অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়, এমন কি মঠের ভক্তদের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ জানাতে যায়। কিন্তু তাদের সন্তানেরা বিড়ি, সিগারেট, গাঁজা, মদ, সেবন করে, জুয়া, তাস, আড্ডাখানা খুলে, জীবহত্যাদি নানাবিধ অপকর্ম করেও বদ্ধ সংসারে মজে থাকুক, তাতে মাতা-পিতা চুপ থাকবে এবং তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে সন্তানের জন্য কারো কাছে নালিশ মোকদ্দমা চালাবে না।
বৈদিক শাস্ত্রে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সন্তানকে যারা কৃষ্ণভজন করতে শিক্ষা দেয় না, তারা আসলে পিতা-মাতা নয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে–
পিতা ন স স্যাৎ, জননী ন স স্যাৎ।
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্ ॥ (ভাগবত ৫/৫/১৮)

অর্থাৎ, সন্তানকে ভক্তিপথের উপদেশ দ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার থেকে মোচন করতে না পারেন, সেই পিতা 'পিতা' নন। অর্থাৎ, তাঁর সন্তান উৎপাদন বিষয়ে যত্ন করা উচিত নয়, এবং সেই জননী 'জননী' নন, অর্থাৎ, সেই জননীর গর্ভধারণ কর্তব্য নয়।
প্রকৃত পিতা-মাতা তাঁরাই যাঁরা তাঁদের সন্তানকে কৃষ্ণভক্তি শিক্ষাদেন। শ্রীচৈতন্য মঙ্গল কাব্যে তাই বলা হয়েছে–

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥

অতএব একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমভক্তিদাতা পিতা-মাতা আশীর্বাদ আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য আনুকূল্যপ্রদ।

৬। প্রশ্ন : যে সমস্ত অপসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব মাছ-মাংস খাচ্ছেন, তাঁরা তো বলে থাকেন, আত্মাকে কষ্ট না দিয়ে আত্মা যা চায় তা-ই খাওয়া ভাল। সেটি কি ঠিক?

প্রশ্নকর্তা: নুপুর রাণী মন্ডল, বেলতলী, মুন্সীগঞ্জ।
উত্তরঃ মাছ-মাংস খেয়ে আত্মাকে বেশি কষ্ট দেওয়া হয়। আত্মা হচ্ছে পরমাত্মা শ্রীহরির অংশকণা, শ্রীহরির নির্দেশমতো পরিচালিত হয়ে আত্মা সন্তুষ্ট হয়। অন্যথায় সে জড়জাগতিক সংস্পর্শে থেকে কষ্টভোগ করে। মাছ-মাংসভোজী মানুষেরা নরকগতি লাভ করে। স্থুল দেহ ত্যাগের সময় সুক্ষ্ম-শরীর বিশিষ্ট জীবাত্মাকে যমদূতেরা নরকলোকে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড শাস্তি প্রদান করে। শ্রীমদ্ভাগবতে সেই কথা বর্ণিত রয়েছে। সুতরাং মাছ-মাংস খাওয়ার ফলে আত্মার কষ্টই লাভ হয়।
এই সব কথা অনুধাবন করে বহু মানুষ অপসম্প্রদায়ী ভাবধারা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন এবং আমিষ-আহার বর্জনপূর্বক নতুন করে শুচিশুদ্ধ জীবন যাপন করছেন।

৭। প্রশ্ন : মা কালী কি মাংস খান? যদি না হয়, তবে পাঁঠা বলি দেওয়া হয় কেন?

প্রশ্নকর্তা: প্রহ্লাদ দাস, বাসাবো, ঢাকা।
উত্তরঃ শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের (৪/১৯/৩৬) শ্লোকে তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন– "মা কালী হচ্ছেন শিবের সাধ্বী স্ত্রী। তিনি শিবের উচ্ছিষ্ট মাত্র গ্রহণ করেন। শিব নিরামিষাশী, প্রসাদভোজী। তাই মা কালী কখনও আমিষাশী নন।"
শিব পরম বৈষ্ণব। তিনি বিশেষ কৃপা করে ভূত প্রেত পিশাচদেরও আশ্রয় দিয়েছেন। তেমনই মা কালীও যক্ষিনী, ডাইনী ইত্যাদিকে আশ্রয় দিয়েছেন। এই শ্রেণীর প্রাণীরা যাতে জগতে খুব উৎপাত না করে, সেই জন্য রক্তমাংসে হাড় ভক্ষণের প্রবল প্রবণতাকে সংযত করার উদ্দেশ্যে মা কালী তাদের আশ্রয় দিয়েছেন। পিশাচগুণসম্পন্ন অর্থাৎ, তামস প্রকৃতির মানুষদের জন্য– যার বিধান হচ্ছে, অমাবস্যার গভীর রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে মহামায়ার উগ্ররূপে কালীমূর্তির সামনে কোনও একটি পাঁঠাকে বলি দিয়ে তার মাংস ভক্ষণ করা যায়। শাস্ত্রের এই বিধান মাংসাহার নিয়ন্ত্রণের জন্যই।
কালক্রমে বিভিন্নভাবে লোকে বলিপ্রথার দোহাই দিয়ে অসংখ্য প্রাণী হত্যা করতে থাকলে ভগবান শ্রীবিষ্ণু বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হয়ে বলি প্রথা নিষিদ্ধ করেন।
কলিবদ্ধ মানুষ সমস্ত বিধিনিষেধ এড়িয়ে উন্মুক্ত পিশাচের মতো অসংখ্য কসাইখানা খুলে বসেছে। আর দিন দিন অগণিত পশুহত্যা যাচ্ছে, যদিও বা অনুরূপভাবে তাদেরও কর্মফল চক্রে নিহত হতে হবে।
শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের (৫/৯/১৮) শ্লোক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, "আসুরিক প্রবৃত্তির মানুষেরা কিছু জাগতিক লাভের জন্য কালীর পূজা করে। কিন্তু তাদের সেই পূজার নামে তারা যে পাপ করে, তা থেকে তারা অব্যাহতি পায় না। প্রতিমার সম্মুখে বলি দেওয়া নিষিদ্ধ।

শ্রীশ্রী গোবর্ধন পূজা

– শ্রী প্রেম রঞ্জন দাস ব্রহ্মচারী

দ্বাপর লীলায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বয়স যখন মাত্র সাত বছর তখন গোবর্ধন পূজার প্রচলন হয় বলে শাস্ত্রে দেখা যায়। যদিও ভগবানের জন্ম কর্ম সবই দিব্য যা তিঁনিই শ্রীমদ্ভগবদগীতায় উল্লেখ করেছেন, "জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্" "৪/৯" অথচ আমরা জড় জাগতিক প্রভাবের কারণে মোহিত হয়ে এহেন দিব্য জন্ম কর্ম নিয়ে গবেষণার অভিসন্দর্ভ রচনায় ব্রতী হয়ে যাই। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় ও নির্দেশনা ব্যতীত কোন কার্যই সম্পাদিত হয় না যেহেতু তিঁনি "অনাদির আদি গোবিন্দ সর্বকারণ কারণম্ ৷" ব্রহ্মসংহিতায় সৃষ্টির আদি জীব ব্রহ্মাজী এরূপ বর্ণনা করেছেন বিধায় তৎকালীন ব্রজবাসীদের বিভিন্ন বিষয়াদি ভগবানের পূর্ব নির্ধারিত সাপেক্ষেই ঘটেছিল অথচ ভগবানের ইচ্ছাতেই আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা তা বুঝতে পারে না।

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।
মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ৷৷গী.৭/২৫৷৷

"আমি মূঢ় ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণের কাছে প্রকাশিত হইনা" অপরদিকে ভগবানের শুদ্ধভক্তগণ সহজেই ভগবানের লীলা অনুধাবন করতে পেরে প্রায় নীরব থাকেন অথবা তা প্রচারে ব্রতী হন।

গোবর্ধন পূজার প্রচলনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে ভগবানের প্রতি প্রণাম নিবেদনের জন্য উচ্চারিত শ্লোক "নমো ব্রহ্মণ্যো দেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ।" এর যথাযথ প্রতিপালন হয়েছে যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান গাভী ও ব্রাহ্মণগণের হিত সাধনে সদা রত রয়েছেন। সাথে সাথে সদাচারী ব্রাহ্মণগণও বৈদিক কর্মকান্ডের দ্বারা গাভীমাতার হিত সাধনে সদা ব্যস্ত। ফলে যে সমাজে ব্রাহ্মণ ও গাভীকূলের হিত সাধন করা হয় সে সমাজে যথাযথ শান্তি বিরাজ করে।

আপাতদৃষ্টিতে শিশু শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন যে, ব্রজবাসীগণ তাদের বিভিন্ন উপাচার সন্নিবেশ করে ইন্দ্রদেবের পূজা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন তখন তিনি নন্দ মহারাজের নিকট ইন্দ্রদেবের পূজা করার আবশ্যকতা জানতে চাইলেন। ব্রজবাসীগণ এবং নন্দ মহারাজ বললেন যে, বৃষ্টির নিয়ন্তা হওয়াতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি কৃষি কাজ সম্পন্ন করতে চাইলে বৃষ্টির প্রয়োজন খুবই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এরূপ উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। যেহেতু সারাদিনই গোবর্ধন পর্বতে গাভীকূল ঘাস খেয়ে বেড়ায়। পর্বতের পাদদেশে বিস্তৃত ফসলের জমিতে শস্য-দানা উৎপাদিত হয় এবং তা গ্রহণ করেই ব্রজবাসীগণ জীবন ধারণ করেন তাই যদি পূজা করতে হয় তাহলে গোবর্ধনধারী গোপালের পূজা তথা গোবর্ধন পর্বতের পূজা করাটাই বিধেয়।
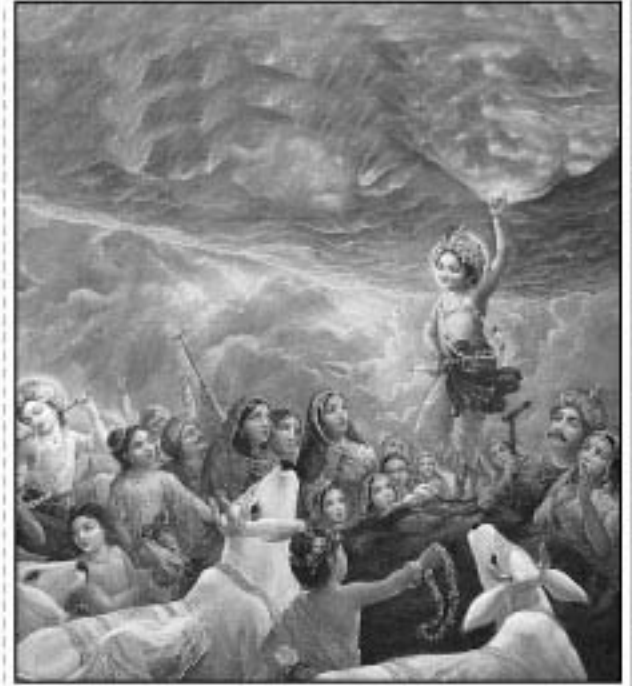
বাস্তবিক গোবর্ধন শব্দের গো অর্থ– গাভী, এবং বর্ধন অর্থ– প্রসার বিধায় গোবর্ধন পর্বতের পূজার মাধ্যমে গাভীকূলের প্রসার সহজতর হবে। আজকের দিনে অবশ্য গাভীকূলের প্রসার ঘটানোর জন্য, যথেচ্ছাচার ভাবে গাভী নিধন পর্যায়ক্রমে হ্রাস করতে হবে এবং উদ্ভিজ্জ আমীষ তথা ডাল, শিম, বরবটিসহ বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ উপাদানকে বিকল্প খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করার বৈদিক নির্দেশনার সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে।

তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যৌক্তিক বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নন্দ মহারাজসহ ব্রজবাসীগণ ইন্দ্রদেবের পূজার পরিবর্তে গো-পূজা, গো-ক্রীড়া এবং গোবর্ধন পূজার আয়োজন করেন, যার অনুরূপে কলিহত জীবদের মুক্তি দানের মানসে শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বব্যাপী ইস্‌কনের বিভিন্ন শাখা কেন্দ্রে গোবর্ধন পূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

তখন ব্রজবাসীদের পূর্ণ আনন্দ আস্বাদন করানোর লক্ষ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পূজার উৎসাহদানের সাথে সাথে গোবর্ধন পর্বতের পাদদেশে জ্যোতিপূজা নামক স্থানে গোপাল রূপে (গোবর্ধনধারী), (গোপাল) সকল নৈবেদ্য (চর্ব, চুষ্য, (লেহ্য), (পেয়) পরমানন্দে গ্রহণ করতে লাগলেন। ফলে নন্দ

মহারাজ ও ব্রজবাসীদের আনন্দ শতগুণে বৃদ্ধি পেতে থাকল এবং সকলেই আরও বেশী করে নৈবেদ্য আনার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন। সকলের মুখে শুধু আনরে, আনরে উচ্চারিত হতে থাকলো তারই ফলশ্রুতিতে বর্তমানে গোবর্ধনের মুখরা বিন্দের পার্শ্বে 'আনর' গ্রাম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বলে জনশ্রুতিতে জানা যায়।

ভগবান তাঁর লীলা প্রকাশের মানসেই এই অনুষ্ঠানের পর ইন্দ্রদেবকে কুপিত করে তুললেন। শাস্ত্র অনুসারে দেবতারাও ভগবানের অংশ বিশেষ হওয়াতে দেবতাদের স্বকীয় কোন ক্ষমতা নেই। ভগবানের শক্তিতেই শক্তিমান হয়ে উঠলেও অনেক সময় তাঁরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। ফলে মায়াদেবীর প্ররোচনায় দেবরাজ ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন। শাস্ত্র মতে ভগবান সকলের ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করলেও কিছুটা মাত্র স্বাধীনতা দিয়ে জীবকে পরিচালনা করেন। ঐ সামান্য মাত্র স্বাধীনতা লাভ করেই মায়বদ্ধ জীব ক্রোধোন্মত্ত হয়ে যায় ঠিক, যেভাবে দেবরাজ ইন্দ্রও হয়েছিলেন। উন্মত্ত ইন্দ্রের নির্দেশে মিথ্যা অহংকার প্রকাশ কল্পে প্রবল বর্ষণ শুরু হলো। বারি-বর্ষণের প্রাবল্যতায় অতিষ্ঠ ব্রজবাসীগণ তখন ভগবানের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং উপস্থিত বিপদ থেকে মুক্তি দানের জন্য সাহায্য কামনা করেন। এমতবস্থায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম প্রীত হন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তগণ যদি ভগবানকে কোন কার্য সম্পাদন করার জন্য অনুরোধ বা আহ্বান জানান তাহলে তিনি অধিক পরিমাণে প্রীত হন। তাই প্রীতি সহকারে মাত্র সাত বছর বয়সে বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে ২১ কিলোমিটার পরিধি বিশিষ্ট গোবর্ধন পর্বত শূন্যে তুলে ধরে তার নীচে সকল ব্রজবাসীকে আশ্রয় নিতে বললেন। তখন ব্রজবাসীগণও সমস্ত ধন-সম্পদ, গাভী ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রসহ সেখানে আশ্রয় নিলেন এবং পরমানন্দে অবস্থান করতে থাকেন। সাত দিন অনবরত বর্ষণ হলেও তাতে ব্রজবাসীগণের কোন ক্ষতি সাধিত হল না বরঞ্চ ভক্ত ও ভগবান একান্ত সান্নিধ্যে অবস্থান করে পরমানন্দ লাভ করতে থাকলেন। ফলশ্রুতিতে দেবরাজ ইন্দ্র নিজের ভুল বুঝতে পেরে বর্ষণ বন্ধ করতে বললেন এবং অহঙ্কার শূণ্য হওয়ার মানসে ভগবানের চরণে আশ্রয় গ্রহণকরতঃ ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। যে স্থানে তিনি ভগবানের শরণ গ্রহণ করেছিলেন অদ্যাবধি শ্রীধাম বৃন্দাবনে সে স্মৃতি রক্ষার্থে শরণাগতিস্থলী মন্দির বিদ্যমান রয়েছে।

এইভাবেই গোবর্ধন পূজার মাধ্যমে তিনি ভগবত্তা প্রকাশ করে ভক্তদের আনন্দ বর্ধন করলেন এবং ইন্দ্রদেবের অহংকার চূর্ণ করে তাঁরও মুক্তি নিশ্চিত করলেন।

(২৪ পৃষ্ঠার পর) **আমি কিভাবে কৃষ্ণ ভক্ত হলাম**

ধরে। আমার একটি চোখ জ্বলে অন্ধ হয়ে যায়। মার খেতে খেতে আমাদের কোমর ভেঙে গিয়েছিল। অনেক ভক্তকে বিষ ইনজেকশন করে পাগল বানিয়ে দেওয়া হয়। মহিলা ভক্তরাও তাদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পায়নি। দু'বছর আমরা প্রায় অনাহারে ছিলাম। আমাদের প্রায় সকলেরই যক্ষা হয়েছিল। আমাদের শুধু এক টুকরা করে পচা পাউরুটি দেওয়া হত। দু'জন ভক্ত মারা যায়। একটি শিশুও মারা গিয়েছিল।

অবশেষে একদিন আমি আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু শ্রীগুরু গৌরাঙ্গের কৃপায় সেদিনই আমি সংবাদ পেলাম যে, রাশিয়াতে ধর্মীয় স্বাধীনতা সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছে। তাই আমাদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

শীঘ্রই আমি জেল থেকে মুক্তি পেলাম। পরে জানতে পেলাম যে, জেলে থাকাকালীন শ্রীমৎ হৃষিকেশ স্বামী আমাদের সকলকেই দীক্ষা দান করেছেন। আমার নাম হয় সর্বভাবনা দাস।

কয়েক বছর রাশিয়াতে প্রচার করার পর আমি মায়াপুর চলে আসি। শুদ্ধ ভক্ত হয়ে গুরু-গৌরাঙ্গের বাণী প্রচার করাই আমার জীবনের লক্ষ্য। কেননা এ ছাড়া পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অন্ধকার। সাক্ষাৎকার : প্রেমাঞ্জন দাস।
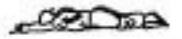
(৬ পৃষ্ঠার পর)

অনুসন্ধেয়। পাশ্চাত্যদেশের সর্বপ্রকার জ্ঞান যে ভারত হইতে গিয়াছে, তাহা সকল সহৃদয় পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। দর্শন-শাস্ত্রের গুরুগণ সময় সময় ম্লেচ্ছশিষ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহা অনেক পুরাতন আখ্যায়িকাতে আছে। ঐ সমস্ত আখ্যায়িকা ভাল করিয়া বিচার করিলে অনেক বিষয় জানা যায়।

ছান্দোগ্যে ইন্দ্র ও বিরোচনের প্রজাপতির নিকট তত্ত্বশিক্ষার যে আখ্যায়িকা আছে তাহাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, বিরোচন ম্লেচ্ছ বুদ্ধির স্থূলতাক্রমে এই জড়দেহকে আত্মা বলিয়া স্থির করত মৃত্যুর পর জড় দেহের সংরক্ষণ ব্যবস্থা তদীয় ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার ইজিপ্ট-দেশীয় শিষ্যগণ সেই শিক্ষা-ক্রমে "মামি" অর্থাৎ মৃতদেহ-সংরক্ষণ-প্রথা স্বদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানশাস্ত্র যত উন্নত হইবে, এই সমস্ত ততই স্পষ্ট বোধ হইবে।

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করুন এবং সুখী হোন
-শ্রীল প্রভুপাদ

সকলেই ভগবানের পূজা করার যোগ্য

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। এক শ্রেণীর মানুষকে বলা হয় অকামী, অর্থাৎ যাদের কোন রকম জড়-জাগতিক কামনা-বাসনা নেই। জড়-জাগতিক হোক বা আধ্যাত্মিক হোক, বাসনা অবশ্যই থাকবে। মানুষ যখন তার নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের আকাঙ্ক্ষা করে, তখন জড় বাসনার উদয় হয়। যিনি পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সবকিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত, তাঁর বাসনা চিন্ময়। মহাত্মা নারদের উপদেশ ধ্রুব মহারাজ গ্রহণ করেননি, কারণ সমস্ত জড়-জাগতিক বাসনা নিরস্ত করার এই উপদেশ পালনে, তিনি নিজেকে অযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু এই কথা সত্য নয় যে, যাদের জড় বাসনা রয়েছে তারা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে পারবে না। ধ্রুব মহারাজের জীবন কাহিনীর এইটি হচ্ছে মূল শিক্ষা। তিনি স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে, তাঁর হৃদয় জড় বাসনায় পূর্ণ। তিনি তাঁর বিমাতার দুরুক্তির দ্বারা অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন, কিন্তু যাঁরা পারমার্থিক মার্গে উন্নত, তাঁরা কখনও কারও নিন্দা অথবা স্তুতির পরোয়া করেন না।

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত, তাঁরা জড় জগতের দ্বৈতভাবের দ্বারা প্রভাবিত হন না। কিন্তু ধ্রুব মহারাজ স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে, তিনি জড়-জাগতিক সুখ-দুঃখের অতীত নন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, নারদ মুনির উপদেশ অত্যন্ত মূল্যবান, তবুও তিনি তা গ্রহণ করতে পারেননি। এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, জড় বাসনাগ্রস্ত ব্যক্তিরা ভগবানের পূজা করার যোগ্য কি না? তার উত্তর হচ্ছে যে, সকলেই ভগবানের পূজা করার যোগ্য। কারও যদি জড়-জাগতিক বহু কামনা-বাসনা থেকেও থাকে, তা হলেও তার উচিত ভক্তিসহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা, যিনি কৃপাপূর্বক সকলের বাসনা পূর্ণ করেন। এই বর্ণনা থেকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা থেকে কেউ বঞ্চিত নয়, তার হৃদয়ে যতই কামনা-বাসনা থাকুক না কেন।

বলা হয় যে, হৃদয় বা মন ঠিক একটি মাটির পাত্রের মতো; একবার তা ভেঙ্গে গেলে, তাকে আর কোন উপায়েই সারানো যায় না। ধ্রুব মহারাজ নারদ মুনিকে এই দৃষ্টান্তটি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর বিমাতার দুরুক্তিরূপ বাণের দ্বারা তাঁর হৃদয় বিদ্ধ হওয়ায় তা এমনই মর্মাহত হয়েছে যে, সেই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনা ছাড়া আর কোন কিছুই তাঁর রুচি নেই। তাঁর বিমাতা তাঁকে বলেছিলেন যে, যেহেতু মহারাজ উত্তানপাদের অবহেলিত রানী সুনীতির গর্ভে তাঁর জন্ম হয়েছিল, তাই ধ্রুব মহারাজ রাজসিংহাসনে অথবা তাঁর পিতার কোলে বসার উপযুক্ত ছিলেন না। অর্থাৎ, তাঁর বিমাতার মত অনুসারে, তিনি রাজা হওয়ার যোগ্য ছিলেন না। তাই ধ্রুব মহারাজ দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার পদ থেকেও উচ্চতর লোকের রাজা হওয়ার সংকল্প করেছিলেন।

ধ্রুব মহারাজ পরোক্ষভাবে মহর্ষি নারদকে জানিয়েছিলেন যে, চার প্রকার মানবোচিত মনোভাব রয়েছে–ব্রাহ্মণোচিত মনোভাব, ক্ষত্রিয়োচিত মনোভাব, বৈশ্যোচিত মনোভাব এবং শূদ্রোচিত মনোভাব। এক বর্ণের মনোভাব অন্য বর্ণের মানুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। নারদ মুনি যে দার্শনিক মনোভাবের উপদেশ দিয়েছিলেন, তা ব্রাহ্মণের উপযুক্ত হলেও ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত নয়। ধ্রুব মহারাজ স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁর মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত বিনয়ের অভাব ছিল, এবং তাই তিনি নারদ মুনির দর্শন স্বীকার করতে অক্ষম ছিলেন।

ধ্রুব মহারাজের উক্তিটি ইঙ্গিত করে যে, শিশুকে যদি তার প্রবৃত্তি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া না হয়, তা হলে তার পক্ষে কোন বিশেষ মনোভাব বিকশিত করা সম্ভব নয়। গুরুদেব বা শিক্ষকের কর্তব্য হচ্ছে, বিশেষ বালকের মনোবৃত্তি পর্যবেক্ষণ করে তাকে বিশেষ বৃত্তি অনুসারে শিক্ষাদান করা। ধ্রুব মহারাজ ইতিমধ্যেই ক্ষত্রিয়োচিত মনোভাব অনুসারে শিক্ষা লাভ করেছিলেন, এবং তাঁর পক্ষে ব্রাহ্মণ্য দর্শন গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। আমেরিকায় ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়োচিত মনোভাবের বৈষম্যের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। যে-সমস্ত আমেরিকান বালকেরা শূদ্রোচিত শিক্ষালাভ করেছে তারা রণভূমিতে যুদ্ধ করার উপযুক্ত নয়। তাই, যখন তাদের সেনাবাহিনীতে যোগদান করার জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করে, কারণ তাদের মনোভাব ক্ষত্রিয়োচিত নয়। সমাজে এটিই হচ্ছে মহা অসন্তোষের কারণ।

বালকদের ক্ষত্রিয়োচিত মনোভাব না থাকার অর্থ এই নয় যে, তারা ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীতে শিক্ষিত হয়েছে, তাদের শূদ্রের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, এবং তার ফলে নিরাশ হয়ে তারা হিপি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, তারা শূদ্রত্বের সর্ব নিম্নস্তরে অধঃপতিত হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী লাভের শিক্ষা প্রাপ্ত হচ্ছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যেহেতু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের দ্বার সকলেরই জন্য খোলা রয়েছে, তাই সকলেই ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন করতে পারে। বর্তমান সময়ে এটি সব চাইতে বড় প্রয়োজন, কারণ এখন প্রকৃতপক্ষে কোন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় নেই, কেবল রয়েছে কিছু বৈশ্য আর অধিকাংশে মানুষই হচ্ছে শূদ্র।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র– এই চারটি বর্ণে সমাজকে বিভক্ত করার পন্থাটি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। মানব সমাজরূপ শরীরে ব্রাহ্মণেরা হচ্ছেন মাথা, ক্ষত্রিয়েরা বাহু, বৈশ্যেরা উদর এবং শূদ্রেরা পা। বর্তমান সময়ে সেই শরীরটিতে পা রয়েছে আর উদর রয়েছে, কিন্তু তাতে মাথা নেই অথবা বাহু নেই, এবং তাই এই সমাজের সব কিছুই ওলটপালট হয়ে গেছে। এই অধঃপতিত মানব-সমাজকে আধ্যাত্মিক চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করার জন্য ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।